জীবন্ত কঙ্কাল
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

জীবন্ত কঙ্কাল—৮২

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণে প্রকাশক

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ আগষ্ট ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বনহুরের ভারী বুটের শব্দে পাষাণ প্রাচীর যেন থর থর করে কেঁপে উঠলো। এগিয়ে চলেছে বনহুর, তার দু'পাশে দু'জন অনুচর রহমান আর রাম সিং। তিন জনার দেহেই জমকালো পোশাক। জমকালো সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে এসে দাঁড়ালো বনহুর স্বর্ণগুহার সম্মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণগুহার দরজা খুলে গেলো।

ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পেলো স্তূপাকার স্বর্ণের উপরে পড়ে আছে একটি কঙ্কাল। হয়তো বা কয়েক দিন পূর্বে তার মৃত্যু ঘটেছে।

বনহুর বললো—নিয়ে যাও রিলিফ প্রধানের দেহটা, প্রকাশ্য রাজপথে রেখে এসো। ওর মুখের গহ্বরে কিছু স্বর্ণগুঁজে দিও তারপর লিখে রেখো একটি চিঠি।

রহমান বললো—চিঠিতে কি লিখা থাকবে সর্দার?

লিখো, স্বর্ণভক্ষণ আশায় আমি দুঃস্থ জনগণের মুখের গ্রাস ভক্ষণ করেছি তাই আমার স্বর্ণভক্ষণে মৃত্যু.....ইতি কান্দাই রিলিফ প্রধান! কথাটা শেষ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বনহুর তারপর হাসি থামিয়ে বললো, যারা জনগণের মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনি মিনি খেলছে তাদের প্রতিটি ব্যক্তির এই অবস্থা হবে। মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে হয়তো এরা বেঁচে যাবে কিন্তু খোদার বিচারে এদের পরিত্রাণ নাই! হাঁ, তারপর জম্বুর রত্নাগারে যে সব হর্তাকর্তা বিধাতাদের আশ্রয় দিয়েছিলো তাদের সংবাদ কি রহমান?

রহমান বললো—রামসিং জানে সব।

রামসিং?

সর্দার জম্বুর রত্নাগারে যাদের আটক করে রাখা হয়েছে তাদের কেউ এখনও জীবন হারায়নি, কারণ আপনার আদেশ অনুযায়ী তাদের প্রত্যেক কে প্রতিদিন এককাপ পানি আর একটি শুকনো রুটি দেওয়া হয়।

চমৎকার! তাদের জন্য এই চরম শাস্তি। ক্ষুধার জ্বালা কেমন তারা নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছেন এখন।

সর্দার তাদের দেখলে চিনবার উপায় নাই। এক একটি জীবন্ত কঙ্কাল বনে গেছে। তারা একদিন পেট পুরে খেতে চায় কিন্তু আপনার আদেশ না পেলে আমরা.........

রামসিং-এর কথার মাঝখানে বলে উঠে বনহুর—না, পেট পুরে আর ওরা কোনদিন খেতে পাবেনা। হাঃ হাঃ হাঃ কি চমৎকার ব্যবস্থা আমি তাদের জন্য করেছি। এবার তাঁরা বুঝতে পেরেছেন অসহায় মানুষের খাদ্য নিয়ে উদর পূরণের কি জ্বালা। রামসিং তোমরা কি দেখেছো পথে-ঘাটে অসহায় মানুষের সে কি করুণ অবস্থা?

রামসিং আর রহমান মাথা নিচু করে থাকে।

বনহুর বলে চলে—পথের দু'ধারে উলঙ্গ অর্দ্ধ উলঙ্গ কঙ্কাল আর কত মানুষ পড়ে পড়ে ধুকছে, ওরা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। কেনো আজ এদের এ অবস্থা কেনো! এদের এ অবস্থার জন্য দায়ী কারা?

রহমান আর রামসিং-এর মুখের দিকে তাকায় বনহুর। তারা নীরব, কোন জবাব দিতে পারে না। বনহুর বলে—এইজন্য দায়ী এ দেশের মানুষ! যারা দেশটাকে পঙ্গু করে দিয়েছে আর দিচ্ছে। কিন্তু এরা কারা জানো—তোমরা? জবাব তোমরা দিতে পারলেও দিবেনা, কারণ কারা সেই নর শয়তান যাদের কথা তোমরাও জানো আমিও জানি, দেশের সবাই জানে কিন্তু বলতে কেউ সাহসী হয় না। আমি বহুবার বলেছি, এরা যারাই হোক না কেন রেহাই পাবে না। জনগণের হিসাবের খাতায় এদের নাম লিখা হয়ে গেছে, মুক্তি পাবে না। ক্ষমা নেই এদের জন্য। একটু থেমে বলে বনহুর—হত্যা এদের করা হবে না। হত্যা করলে ওদের শাস্তি দেওয়া হলো না। মৃত্যু ওদের বাঁচিয়ে নেবে কাজেই এদের শাস্তি স্বর্ণভক্ষণ করানো........স্বর্ণ এরা ভক্ষণ করবে, স্বর্ণকক্ষে এরা শয়ন করবে, স্বর্ণরথে এরা ভ্রমণ করবে। যারা দুর্বল অসহায় তাদের কে পিষে মারবে স্বর্ণরথের চাকার তলায়।

বলে উঠে রহমান—সর্দার দিন দিন এরা আরও ফেঁপে উঠছে। বিদেশ থেকে যে সব সাহায্য দ্রব্য আসছে তার কিঞ্চিৎ মাত্র এরা সামান্য দু'চার জনের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছে আর সব এরা আত্মসাৎ করছে......

জানি রহমান সব জানি। অচিরে বহু খাদ্যশস্য এসেছিলো যা নিয়ে এখন চলেছে ছিনিমিনি খেলা। রিলিফ মানে কি রহমান? ভিক্ষার এক নাম রিলিফ যে দেশের-মানুষ ভিক্ষার জিনিস নিয়ে আত্মসাৎ করে, সে দেশ কোনদিন টিকে থাকতে পারে না। এ দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। আর বেশিদিন নয় ....রহমান?

বলুন সর্দার?

সন্ধান লাভ এবং লিষ্ট করো, কারা জনগণের মুখের গ্রাস এখন আত্মসাৎ করছে। আমি হাজরা থেকে ফিরে এসে এদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করবো।

সর্দার আপনি আবার হাজরায় যাবেন?

হাঁ রামসিং, হাজরায় এখনও আমার কিছু কাজ বাকি আছে। একটু থেমে বলে—আমি আশ্চর্য হয়ে যাই এমন দেশও আছে যেখানে ভাই হয়ে ভাইয়ের মুখের আহার নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। শুধু এক জায়গার নয়, সমস্ত দেশ জুড়ে আজ দুর্নীতি অনাচার চলেছে। এই দুর্নীতি আর অনাচার বন্ধ না হলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে না।

কিন্তু এই দূর্নীতি আর অনাচার কি রোধ করা সম্ভব হবে সর্দার?

হয়তো হবে না, কারণ দেশে এখন এমনভাবে অনাচার চলেছে যে অনাচার বন্ধ করতে হলে দেশের শাসক-গোষ্ঠিকে আগে দমন করতে হবে......যারা অনাচারের মূল স্তম্ভ।

সর্দার আমারও তাই মনে হয়। ধরুন যদি কোন সাধারণ লোক দূর্নীতি বা অনাচার করে তাদের সায়েস্তা করা অত্যন্ত সহজ হয়, কিন্তু যারা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, যারা দেশের রক্ষক তারা যদি ভক্ষক হয় তা হলে তাদের বিরুদ্ধে কেউ টু'শব্দ করতে পারেনা, সায়েস্তা করা তো দূরের কথা।

হাঁ ঠিক্ বলেছো রহমান, দেশকে পঙ্গু করে দিচ্ছে ঐ শ্রেণীর লোক যাদের বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দ উচ্চারণ করতে সাহসী নয়।

কিন্তু বিচার এদেরও হবে সেদিন বেশিদূরে নয়। যাও রহমান, তুমি কান্দাই আস্তানায় যাও। রামসিং তুমি ফিরে যাও জম্বু আস্তানায়। জম্বুর যারা হর্তা-কর্তা-বিধাতা, যাদের রত্নাগারে বন্দী করে রেখেছো তাদের দিকে লক্ষ্য রেখো যেন তারা মরে বেঁচে না যায়। আমি ফিরে এসে এদের ব্যবস্থা করবো।

আচ্ছা সর্দার। রামসিংহ বললো।

রহমান বললো—আপনি হাজরায় যাবার পূর্বে একবার বৌরাণীর সঙ্গে দেখা করে যাবেন। কারণ নূর-এর বিলাত যাবার দিন নিকটস্থ হয়ে এসেছে।

আচ্ছা তাই করবো।

রহমান ও রামসিং কুর্নিশ জানালো। বনহুর বিদায় নিলো সেখান থেকে। এবার রহমান আর রামসিং স্বর্ণগুহার মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

রিলিফ প্রধানের মৃত দেহটা পড়ে আছে স্বর্ণস্তূপ-এর উপরে। একটি কঙ্কাল। হঠাৎ দেখলে কেউ চিনতেই পারবে না এটা কার মৃতদেহ।

রহমান আর রামসিং যখন রিলিফ প্রধানের কঙ্কালসার মৃত দেহটা নিয়ে ভাবছে তখন বনহুর তার বিশ্রামাগারে এসে পৌঁছে গেছে।

শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় দেহটা এলিয়ে দিতেই দরজার পর্দা ঠেলে কক্ষে প্রবেশ করলো দিপালী।

বনহুর মুখ তুলে বললো—তুমি!

হাঁ আমি এলাম। রাজকুমার এতোদিন তুমি কোথায় ছিলে বলো? কেনো আসনি?

কাজ নিয়ে বাহিরে ছিলাম।

সত্যি আমি বড় হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। রাজকুমার কতদিন তোমাকে দেখিনি......দিপালী বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।

বনহুর একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে।

দিপালী বলে—আমি যে দিন দিন হাঁপিয়ে উঠেছি—রাজকুমার?

কি চাও বলো?

যা চাহিবো তা কোনোদিন পাবো না জানি'। তবু তো আমাকে বাঁচতে হবে। আমাকে কাজ দাও? আমি কাজের মধ্যে হারিয়ে যেতে চাই।

কাজ!

হাঁ কাজ করতে চাই আমি।

একদিন বলেছিলাম তোমাকে আমাদের প্রয়োজন।

হাঁ, বলেছিলে।

কিন্তু কোন প্রয়োজনে তোমাকে কাজে লাগাইনি। শোন দিপালী—আমি তোমাকে আমার কান্দাই জঙ্গলের আস্তানায় নিয়ে যাবো—আমার আস্তানায় বহু কাজ আছে যা তুমি ভাল মনে করো তাই তুমি করতে পারবে।

সবচেয়ে বেশি খুশি হবো তোমায় সহায়তা করতে পারলে, আমি সব সময় তোমার পাশে থাকতে চাই রাজকুমার।

দিপালী।

হাঁ রাজকুমার, তুমি তো জানো এ দেশে আমার কেউ আপনজন নাই......

থাকলে তো আমি বেঁচে যেতাম দিপালী। তোমাকে তোমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছে দিয়ে নিস্কৃতি পেতাম কিন্তু তা হলো না।

জড়িয়ে পড়েছি তোমার পায়ে শিকলের মত তাই না?

আচ্ছা দিপালী?

বলো?

মোহসিনকে তোমার কেমন লাগে?

হঠাৎ আজ এ প্রশ্ন কেনো?

তুমি হয়তো জানো না, মোহসিন তোমাকে ভালবাসে। সে সুন্দর সু-পুরুষ , তার মধ্যে মহত্বের কোন অভাব নেই -------

যা বলতে চাইছো তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তা হয় না। তোমাকে পাবো না জানি তবু আমি আমার সমস্ত মন-প্রাণ যে তোমার চরণে উৎসর্গ করেছি রাজকুমার।

দিপালী তুমি অন্যান্য মেয়েদের মত অবুঝ নও তাই ...

কিন্তু আমি যে পারি না রাজকুমার তোমাকে ভুলতে। জানো তোমাকে না দেখলে আমার কত কষ্ট হয়। বুক ভেসে যায় আমার অশ্রুজলে, কত আশা নিয়ে আমি পথ চেয়ে থাকি তোমার ..... দিপালী বনহুরের একখানা হাত মুঠায় চেপে ধরে। তার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, তার আংগুলের ফাঁকে সিগারেটটা থেকে অনর্গল ধুম্র নির্গত হয়ে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তখন তার মন চলে গেছে দূরে অনেক দূরে সেই হিম্মৎঃ খাঁর জীবন কাহিনীর একটি খণ্ডে। একটি বলিষ্ট চেহারার লোক এগিয়ে গেলো, সে পথ থেকে তুলে নিলো কোলে একটি ছোট্ট মেয়েকে তারপর চোরের মত এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখতে দেখতে পালিয়ে গেলো---- বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বললো– হিম্মৎ খাঁ? দিপালী তোমার জীবনের জন্য দায়ী সেই-নরপশু হিম্মৎ খাঁ। ওর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু ও রেহাই পাবে না। তোমার জীবনের জন্য সে পরকালেও রেহাই পাবে না। ফুলের মত নিষ্পাপ একটি মেয়ে, তোমাকে সে নিয়ে এসেছিলো তার ব্যবসায় সামগ্রি হিসাবে ব্যবহার করতে। ......শয়তানটাকে হত্যা করে আমি ভুল করেছি— না হলে আমি এখন ওর শরীরের চামড়া খুলে লবণ মাখিয়ে তিল তিল করে মারতাম।

❑

আম্মি, আম্মি দেখো কে এসেছেন! নূর ব্যস্তভাবে মনিরার ঘরে প্রবেশ করে?

ফিরে তাকায় মনিরা, সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখে আনন্দ উপছে পড়ে, অস্ফুট কণ্ঠে বলে, এসেছো?

হাঁ মনিরা এলাম। বনহুর বিছানার পাশে বসে পড়ে।

নূর দাদীকে ডাকতে বেরিয়ে যায়।

বনহুর মনিরার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়—আজ রাগ করোনি তো?

না গো, না।

ভয় হয়।

কেনো?

যদি মুখ গোমরা করে বসে থাকো তাই? বনহুর অতি লঘু হস্তে মনিরার মুখখানা তুলে ধরে—মনিরা বেশিক্ষণের জন্য আসিনি, এখুনি আমাকে যেতে হবে।

জানি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবোনা তোমাকে। তবু ছাড়ছি না সহজে কারণ অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বনহুর.স্ত্রীর দেহের উপর কিছুটা হেলান দিয়ে বসে বলে, বেশ বলো?

এখন না আগে কিছু মুখে দাও।

তোমার স্পর্শই আমার পক্ষে যথেষ্ট মনিরা। পরশমণির পরশে লোহা যেমন সোনা হয়—তেমনি তোমার পবিত্র পরশে আমার জীবন ধন্য হয়......

চুপ করো। সত্যি এতোদিন আসোনি বড় একা একা লাগে আজকাল। নূর চলে যাবে কথাটা ভাবতেই যেন একেবারে মুষড়ে পড়ি।

মনিরা কোন চিন্তা করোনা, নূর তো বেশ বড় হয়েছে—কত ছেলে মেয়ে অতি শিশুকাল থেকেই বিদেশে শিক্ষালাভ করে আসছে আর নূর তো এখন সব বুঝতে শিখেছে!

তুমি ওর বিদায় দিনে আসবে না?

হয়তো আসবো কিন্তু তুমি বলো আসাটা কি ঠিক হবে, কারণ জানো সেখানে অনেকেই থাকবেন যারা তোমার স্বামীর সন্ধানে সদা নিয়োজিত রয়েছেন।

তা'হলে?

আসবো দূর থেকে আমি ওকে দেখবো, আশীর্বাদ জানাবো। মনিরা তুমি এখন ওর পাশে থেকো, বলো আমি কোন কাজে আসতে পারিনি।

মনিরার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো এমন সময় মরিয়ম বেগম সহ নূর প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

বনহুর দ্রুত মায়ের পাশে এসে মায়ের ডান হাত খানা তুলে নিয়ে চুম্বন করে বললো—কেমন আছো মা?

ভালই আছি বাপ, তুই কেমন ছিলি?

দেখতেই পাচ্ছো।

শরীরটা কেমন রোগা হয়ে গেছে তোর।

ও তোমার চোখে অমন লাগবেই। দেখলে নূর, কত মোটা সোটা হয়ে গেছি তবু তোমার দাদীমার কথা শোন।

নূর বলে উঠে—আব্বু, তুমি কিন্তু আগের চেয়ে বেশ রোগা হয়ে গেছো।

হেসে বলে বনহুর—মনিরা দেখো নূরও মার সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাকে রোগা করে ফেলেছে......আদর করে নূরকে টেনে নেয় বনহুর কোলের কাছে।

নূর এখন পূর্বের সেই ছোট্টটি নেই তাই সে পিতার কোলের কাছে গিয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলে।

মরিয়ম বেগম বলে উঠেন—এতোদিন কোথায় ছিলি মনির?

জানো তো মা, আমার কত কাজ, কখন কোথায় থাকতে হয় সঠিক বলতে পারছি না, তোমাকে। মা, দেশ আজ অনাচারে অবিচারে ভরে গেছে। এতোটুকু শান্তির জন্য মানুষ আজ উন্মাদ। পথে-ঘাটে দুঃখী মানুষের মৃতদেহের স্তূপ......

মুহূর্তে বনহুরের আসলরূপ পাল্‌টে যায়, দু'চোখে আগুন ঠিকরে বের হয়। বলে বনহুর—এক শ্রেণীর মানুষ আজ আমাদের সমস্ত দেশটাকে গোরস্তানে পরিণত করেছে।

বললেন মরিয়ম বেগম—এরা কারা বাবা?

তুমি জানো না মা এরা আমাদেরই দেশে মানুষ নামধারী জানোয়ার। একটু থেমে বলে সে—এরাই দেশের অধিনায়ক কারণ এদের হাতেই রয়েছে আমাদের দেশের দুঃখী মানুষের ভবিষ্যৎ.....

সে তো খোদার হাতে?

আগে ছিলো, এখন এরাই মানুষের ভাগ্যনীয়ন্তা। জানো মা, এই নর পশুরা আজকাল কি করছে? দেশের সম্পদ খাদ্যশস্য তো বিদেশে পাচার করছেই এ ছাড়া এক নতুন কাজে নিয়োজিত হয়েছে এরা।

কি কাজ বাবা?

ষড়যন্ত্র। বিদেশীদের ষড়যন্ত্রের চাবিকাঠি হয়েছেন এই সব ভাগ্যনিয়ন্তাগণ। যারা মুখে বড় বড় বুলি আওড়ায় আর তলে তলে সর্বনাশ করে চলেছে। আমাদের দেশকে পঙ্গু করে দেবার জন্য, দেশের মানুষকে নিঃশেষ করে দেবার জন্য, বিদেশী বন্ধুদের চক্রান্তে সহযোগীতা করে চলেছেন আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক হর্তা-কর্তা পশুর দল। এইসব নরাধমদের দ্বারা তারা দেশের সম্পদ তো উদ্ধার করে নিচ্ছেনই—এ ছাড়া নতুন এক কাজে নিয়োজিত হচ্ছেন বিদেশী বন্ধুগণ। সে কাজ কি জানো মা? আমাদের দেশের কল-কারখানা, যার দ্বারা দেশ বাঁচতে পারে সেই কল-কারখানায় কৌশলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অকেজো করে দিচ্ছে। ফলে দেশ সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। যারা কল কারখানায় কাজ করতো তারা কিছু সংখ্যক মরছে বিস্ফোরণে, আর যারা বেঁচে থাকছেন তারা বেকার হয়ে খাদ্যাভাবে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করছেন—কারণ তারা না পারছে ভিক্ষা করতে, না পারছেন চুরি ডাকাতি করতে। তবে হেঁ অনেকে এ সবে বাধ্য হচ্ছেন পেটের ক্ষুধায় ভিক্ষা করতে। অভ্যস্ত না হয়েও ভিক্ষা করছেন—চুরি ডাকাতি করতে না জানলেও করতে চেষ্টা করছেন। বিদেশী বন্ধুদের সূতীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে আমাদের দেশের মানুষ খেলনা বনে গেছে। বুঝতে পারছে না বিদেশীদের চক্রান্তে নিজের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারছেন......এ্যাঁ, কি সব যা-তা বলছি, আমাকে ক্ষমা করো মা?

না বাবা, তুই মিথ্যা বলিস নি। জানিস মনির, সেদিন আমি বাহিরে গিয়েছিলাম, দেশের মানুষের যে অবস্থা দেখলাম তাতে আমি কিছুতেই চোখের পানি রোধ করতে পারলাম না......বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো মরিয়ম

বেগমের গলা। তিনি চোখ মুছে বললেন—পথের ধারে কঙ্কালসার মানুষগুলো কেউ উলঙ্গ কেউ অৰ্দ্ধ উলঙ্গ পড়ে আছে। ওদের চাহিবার কোন ক্ষমতা নাই—ক্ষুধার জ্বালায় গলা ওদের শুকিয়ে গেছে......

মা—মাগো, তুমি ক'জনাকে দেখেছো—আজ এই দেশের বুকে লাখো লাখো মানুষের এই অবস্থা। দেশ আজ চরম এক মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে। সব বিদেশী চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশের মানুষকে ধ্বংস করাই হলো তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিন্তু দেশের যারা হর্তা-কর্তা তারা কি এ সবের কিছু বোঝে না?

স্বার্থ-স্বার্থ তাঁদের অঙ্গবধির স্থবির করে দিয়েছে। তারা ঠিকই বোঝেন কিন্তু বুঝেই না বোঝার চেষ্টা করেন কারণ স্বার্থ রয়েছে এর পিছনে।

এবার বললো মনিরা—আশ্চর্য, শিক্ষিত জ্ঞানবান মানুষ হয়েও তারা নিজের দেশের সর্বনাশ করছেন কেমন করে!

সব কথার এক কথা স্বার্থ। দেশ চলে যায়, দেশের মানুষ সবাই মরে যাক্ শুধু বেঁচে থাকবে তাঁরা কিছু সংখ্যক পরিবার।

এ সব তুই কি বলছিস মনির?

হাঁ মা, সত্যি কথা শুনতে বড় নির্মম লাগে। শোন একটা ঘটনা তোমাদের বলছি—কিছুদিন আগে হয়তো শুনে থাকবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সর্ববৃহৎ জুটমিলগুলো একটির পর একটি অগ্নিকান্ডে বিধ্বস্ত হতে লাগলো। জানো এই সব মিল কারখানা ধ্বংস অভিযান চলেছে?

তাই তো বাবা আমি লক্ষ্য করেছি সংবাদপত্রের পাতা খুলতেই শুধু নজরে পড়ে অমুক জায়গায় জুটমিলে ভয়ঙ্কর অগ্নিকান্ডে কোটি কোটি টাকার পাট ভস্মীভূত......

শুধু জুট মিল নয় মা, আমাদের দেশের বড় বড় কল-কারখানাতে প্রায়ই অগ্নিকান্ড আর বিস্ফোরণ লেগেই আছে। একটু থামলো বনহুর তারপর বললো—কলকারখানাই হলো দেশের সম্পদ। জানো মা সব চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র, আমাদের দেশকে পঙ্গু করে দেবার বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে। যাতে এ দেশ সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে আর দেশের সব মানুষ যাতে নিঃশেষ হয়ে যায় এ ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো তাই।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো মরিয়ম বেগম—এ সব তুই কি বলছিস্ বাবা?

সব সত্য মা, সব সত্য। বিদেশী ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছে আজ আমাদের এ দেশ। দেখছোনা মা ক্ষেত-খামারে-কত শস্য উৎপন্ন হচ্ছে তবু দেশে কেমন হাহাকার? আগের চেয়ে চাষী ভাইরা বর্তমানে অনেক বেশি পরিশ্রম করে খাদ্য শস্য উৎপন্ন করে চলেছে, তবু চারিদিকে হাহাকার। দারুণ এক সমস্যার সম্মুখে দেশবাসী আজ মরিয়া হয়ে ভাবছে—পেটে অন্ন নাই, পরনে বস্ত্র নাই। পথে ঘাটে আজ জীবন্ত কঙ্কালের মিছিল......হঠাৎ অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে বনহুর তারপর হাসি থামিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলে—এর জন্য দায়ী কারা, জানো মা?

তা আমি কেমন করে বলবো মনির?

ঠিক, তুমি কেমন করে বলবে—এ দেশে বাস করে তুমি যেমন জানো না তেমনি জানে না এ দেশের অনেকেই। দেশকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিচ্ছে আমাদেরই দেশের মানুষ। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে নিজের পায়ে তারা কুঠারাঘাত করছে। একটি কাহিনী শোন মা—কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশের একটি কারখানা বিধ্বস্ত হয়। কারখানাটি ছিলো আমাদের দেশের মস্ত বড় একটি সম্পদ। এই কারখানা বিধ্বস্ত করবার জন্য বিদেশী চক্রান্ত চলে। তারা আমাদেরই দেশের মানুষের সহায়তায় এই কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটায়। জানো মা, এই কারখানা বিনষ্ট হওয়ায় আমাদের দেশ কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মরিয়ম বেগম অবাক কণ্ঠে বললেন—আমি বুঝতে পারিনা, এতে বিদেশীদের কি স্বার্থ আর বিদেশী চক্রদের সহায়তা করে আমাদের দেশের মানুষেরই বা কি লাভ?

বিদেশীদের স্বার্থ একটি জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া। আর আমাদের দেশের মানুষ যারা এই বিদেশী চক্রান্তে দেশ ও দেশবাসীর সর্বনাশ করে চলেছে তারা হচ্ছে স্বার্থান্ধের দল শুধু স্বার্থান্ধই নয় তারা দেশের শত্রু। মা যতদিন দেশ থেকে শত্রুনিপাত না হবে ততদিন দেশে শান্তি আসবে না। বনহুর একটু থেমে বললো—দিনের পর দিন দেশ অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মরিয়ম বেগম বলে উঠেন—শোনা যায় এবার দেশে প্রচুর শস্যউৎপন্ন হয়েছে। দেশের জনসাধারণ বহু ফসল পাবে। বাবা মনির আমার মনে হয় এবার দেশে শান্তি ফিরে আসবে।

মা, তুমি কেনো বোঝনা—কোন পাতিলের তলায় যদি ফুটো থাকে তা হলে পাতিলে যত পানিই ভরোনা কেনো পাতিল কোনদিন ভরবে না। তেমনি আমাদের দেশের অবস্থা—ঠিক্ ফুটো পাতিলের মত। খাদ্য-শস্য দেশে যা জন্মে তাতে কোনদিনই দেশের মানুষ না খেয়ে জীবন্ত কঙ্কাল হতোনা, তা ছাড়া বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে কোটি কোটি মণ খাদ্য-শস্য আর বিভিন্ন সাহায্য দ্রব্য? এতো পেয়েও কেনো, কেনো আজ দেশের অসহায় মানুষের এ অবস্থা......জানো—জানো মা ঐ নর পশুর দল......

মনিরা এবার কথা বলে—চুপ করো—চুপ করো তুমি। দেশে যা ঘটছে তা কারো অজানা নেই। আড়চোখে সে নূরকে দেখিয়ে দেয়।

বনহুর বুঝতে পারে নূরের উপস্থিতিতে হঠাৎ সে যদি তার গোপন কথা ফাঁস করে ফেলে, তাহলে যদি তার আসল রূপ প্রকাশ পায়, তাই মনিরা তাকে সাবধান করে দিলো।

নূর এতোক্ষণ স্তব্ধ হয়ে শুনেছিলো পিতার কথাগুলো, পূর্বের মত সে এখন ছোট নেই, কাজেই দেশ ও দেশবাসীদের দুঃখ-ব্যথা-বেদনা সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে। জন্মাবার পর থেকেই নূর পিতাকে সব সময় কাছে পায়নি, পায়নি পিতার স্নেহ ভালবাসা। অন্তর জুড়ে তাই একটা অভাব সব সময় তার মনকে কাতর করে রেখেছিলো। পিতাকে পাশে পেলে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেতো সে। পিতার কথাগুলো তার হৃদয়ে স্পর্শ করতো।

নূর বলে উঠলো—আব্বু যারা দেশের শত্রু দেশবাসী কেন তাদের ক্ষমা করে, কেনো তাদের উপযুক্ত সাজা দেয় না?

দেশের অবস্থা এখন চরমে, ক্ষমার দিনও শেষ হয়ে এসেছে। ঘুমন্ত জনগণ জেগে উঠেছে—আর বেশিদিন নয় যারা দেশ ও দশের শত্রু তাদের নিস্তার নেই......কথাগুলো বলে বনহুর থামলো।

এমন সময় সরকার সাহেব প্রবেশ করলেন সেই কক্ষে।

মরিয়ম বেগম আঁচলটা ভালভাবে টেনে দিলেন মাথায়।

বনহুর দাঁড়িয়ে সসম্মানে বললো—বসুন সরকার চাচা।

সরকার সাহেব আসন গ্রহণ করলেন।

মনিরা বললো—সরকার চাচা নূরের বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে আজ সব কথা শেষ করে নিন। ওর বিদেশ যাওয়ার তারিখ নিকটে ঘনিয়ে এসেছে।

সরকার সাহেব বললেন—হাঁ আমি সেই কারণেই এলাম। মনির তুমি এসেছো ভালই হলো, এদিকে নূরের বিদেশ যাত্রার সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে।

আমিও ঐ ব্যাপারে আলাপ করতেই এসেছি সরকার চাচা। বনহুর হাস্যোজ্জল দীপ্ত মুখে কথাটা বললো।

এরপর চললো নানা রকম কথা বার্তা।

মরিয়ম বেগম, মনিরা, সরকার সাহেব আর বনহুর মিলে নূরের বিদেশ যাওয়া নিয়ে কথা বার্তা চললো।

বিশেষ করে মরিয়ম বেগমের চিন্তা নূরকে বিদেশ পাঠিয়ে তিনি কি করে কাটাবেন। এতো বড় বিরাট বাড়ি নূরের অভাবে খাঁ খাঁ করবে। তা ছাড়া নূরের তেমন কোন বয়স হয়নি বিদেশ গিয়ে কোন বিভ্রাট ঘটিয়ে বসবে কিনা তাই বা কে জানে।

মায়ের কথা শুনে হাসলো বনহুর, বললো—মা তুমি মিছামিছি ভাবছো। নূরের চেয়ে কম বয়সেও বহু ছেলে বিদেশে শিক্ষা লাভ করছে। তুমি ওর জন্য কিছু ভেবেনা।

বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে নূরে আগ্রহ কমছিলো না। সে নিজেও মা এবং দাদীমাকে বোঝাতে লাগলো। বললো নূর—তোমরা আমাকে পূর্বের সেই ছোট্টটি মনে করেছো। দেখো বিদেশ গিয়ে ওদিকের সব সংবাদ তোমাদের লিখে জানাবো।

সরকার সাহেব যোগ দিলেন নূরের কথায়—দাদু ঠিক বলেছে, এখন সে আগের সেই নূর নেই এখন সে নূরজ্জামান চৌধুরী বনে গেছে। কেমন দাদু সত্যি কিনা?

হাসলো সবাই।

নূরও হাসিতে যোগ দিলো।

❑

কান্দাই এরোড্রামের অদূরে উঁচু টিলাটির নিচে এসে থামলো একটি মোটর গাড়ি। গাড়ি থামিয়ে নেমে এলো গাড়ির চালক, হাতে তার একটি ছোট্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র। চালকটির দেহে সাহেবী পোশাক, মাথায় ক্যাপ। সে টিলার দিকে এগুতে লাগলো।

টিলার আশে পাশে অনেকগুলো পাইন আর ঝাম গাছ নীরব প্রহরীর মত মাথা উঁচু করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টিলার উপরেও রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক ঝাম গাছ।

চালক টিলার গা বেয়ে উঠে চললো উপরের দিকে। ঝাম গাছের গুড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে টিলার উপরে এসে দাঁড়ালো। হাতের দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে তাকালো চালকটি সম্মুখস্থ এরোড্রামের প্লেট ফরমে থেমে থাকা বিমানখানার দিকে।

যাত্রীগণ তখন বিমানের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিলো।

সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালো নূর হাত নাড়ছে সে সবাইকে লক্ষ্য করে। ও পাশে রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে আছেন মরিয়ম বেগম, মনিরা আর সরকার সাহেব।

মরিয়ম বেগম আঁচলে চোখ মুছছেন বার বার।

মনিরার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে কিন্তু সে নিজকে অতি কষ্টে সংযত করে রেখেছে।

সরকার সাহেব হাত নাড়ছেন, তাঁর চোখ দিয়েও পানি ঝরছিলো। মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন তিনি। শিশুকাল থেকে নূরকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন, আর না করেই বা কি উপায় ছিলো তাঁর। এ বাড়ির সঙ্গে সরকার সাহেব যখন জড়িয়ে আছেন ঘনিষ্ঠভাবে। নিজ নাতির চেয়ে তিনি কোন অংশে কম মনে করেন না নূরকে। আজ সেই নূরকে বিদেশে পাঠাতে গিয়ে মন তার ব্যথা কাতর হবে তাতে কোন ভুল নেই।

নূর যখন হাত নাড়ছিলো তখন দূরে উঁচু টিলার উপরে দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিলো বনহুর। এক সপ্তাহ পূর্বে চৌধুরী বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে এসেছিলো বনহুর, তখন নূর বলেছিলো আব্বু, তুমি ঐদিন আসবে না, যেদিন আমি বিদেশে যাত্রা করবো?

নূরের কথায় মনটা ব্যথায় জর্জরিত হয়ে উঠেছিলো বনহুরের। নূর জানে না তার আব্বু এরোড্রামে তাকে বিদায় জানাতে গেলে তাকে কান্দাই পুরিশ মহল ছেড়ে দেবে না। নূরের বিদেশ যাত্রার সংবাদে কান্দাই পুলিশ মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিলো। গোপন সূত্রে তারা এ সংবাদ সংগ্রহ করেছিলো এবং প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিক্ষা করছিলো। নিশ্চয়ই বনহুর আসবে সন্তানের বিদায়

জানাতে তখন তাকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ কিছুতেই অবহেলা করবে না পুলিশ মহল।

বনহুরের ছবি সহ কয়েকজন গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার কান্দাই এরোড্রামে ছদ্মবেশে অপেক্ষা করছিলো।

নূরকে যখন বিদায় দেবার জন্য তার দাদী, মা এবং সরকার সাহেব এগিয়ে এসেছিলেন তখন ছদ্মবেশী পুলিশ মহল চারিদিকে সতর্কতার সঙ্গে টহল দিচ্ছিলো। তারা সবাইকে তন্ন তন্ন করে লক্ষ্য করছিলো, কারণ তারা জানে বনহুরকে সহজে চিনবার উপায় নেই কারো। এমন কি পুলিশ প্রধান মিঃ জাফরীও এসেছেন। তিনি এরোড্রামের অফিস রুমের উপরে একটি কক্ষে বসে লক্ষ্য করছিলেন নিচের দিকে।

যাত্রীরা সবাই সারিবদ্ধভাবে বিমানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মিঃ জাফরী একে একে সবাইকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য সাধনা করে চলেছেন। পুরস্কারের লোভে বা আশায় নয় তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি বনহুরকে নিজ হস্তে গ্রেপ্তার করবেনই করবেন কারণ বনহুর তাকে বেশ কয়েকবার নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে। জীবনে তিনি বহু দুর্ধর্ষ ডাকাত এবং খুনিকে গ্রেপ্তার করেছেন কিন্তু বনহুরের মত দস্যু তিনি কোনদিন দেখেননি। সে তাঁর মত অভিজ্ঞ পুলিশ অধিনায়ককে পরাজিত করেছে।

কান্দাই পুলিশ মহল গোপন সুত্রে জানতে পারে যে চৌধুরী বাড়ির ছেলে নুরজ্জামান চৌধুরী ওরফে নূর বিদেশ যাত্রা করছেন এবং তাকে বিদায় জানাতে তার আত্নীয়-স্বজন সবাই এরোড্রামে আগমন করবেন। এমন কি বনহুরও আসবে পুত্রকে বিদায় জানাতে কাজেই পুলিশ মহল সজাগ হয়ে উঠেছেন। পুলিশ মহল ছাড়াও গোয়েন্দা বিভাগও এরোড্রামের আশে-পাশে গোপনে সজাগভাবে পাহারা দিয়ে চললো।

নূর সহ বিমানখানা রানওয়ে চক্র দিয়ে আকাশে উড়ে উঠলো।

সরকার সাহেব রুমালে চোখ মুছলেন।

মরিয়ম বেগম আর মনিরা তখনও তাকিয়ে আছেন বিমানখানার দিকে। মরিয়ম বেগম আঁচলে চোখ মুখে ফিরে তাকালেন মনিরার দিকে।

মনিরার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

বিমানখানা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। সবাই বেরিয়ে আসে এরোড্রাম থেকে।

ওদিকে অদূরে পাইন আর ঝাম ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে বনহুর হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে ফেললো। ক্ষুদে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা নামিয়ে রাখলো সে পকেটে। যত পাষাণ প্রাণই হোক না কেনো পুত্রের জন্য বুকটা তার ব্যথায় খান খান হয়ে যাচ্ছিলো। পিতা হয়ে আজ বিদায় মুহূর্তে সে সন্তানের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারলো না—এ তার কম দুঃখ নয়।

ফিরে আসে বনহুর গাড়ির পাশে।

❑

গাড়িখানা এসে থামলো কান্দাই জঙ্গলের পাশে। জঙ্গলের ভিতর তখনও জমাট অন্ধকার বিরাজ করছে যদিও সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে চারিদিকে। বনহুর গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে শিস দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো তাজ। বনহুর তাজের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ওর পিঠ চাপড় দিয়ে উঠে বসলো।

তাজ এবার ছুটতে শুরু করলো। প্রভুকে পিঠে পেয়ে আনন্দ তার যেন ধরছে না। পশু হলেও তাজ এতো বেশি প্রভুভক্ত যে তার মত অশ্ব সহসা কোথাও দেখা যায় না।

উল্কা বেগে ছুটে চললো তাজ।

নূরী জাভেদকে তীর ছোরা শিক্ষা দিচ্ছিলো, সে শুনতে পায় তাজের পদশব্দ। আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠে নূরীর চোখ দুটো। সে জাভেদকে বুকে টেনে নিয়ে বলে—জাভেদ কে আসছে বলো তো বাপ?

জাভেদ তীর ধনু হাতের মুঠায় চেপে ধরে বলে উঠে—বাপু, আমার বাপু আসছে......আম্মু আমি যাই দেখে আসি......

না না, তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো এক্ষুণি তোমার বাপু এসে পড়বে।

জাভেদের চোখে মুখে আনন্দ উপছে পড়তে লাগলো। সে তীর-ধনু হাতে দাঁড়িয়ে রইলো পিতার প্রতিক্ষায়। অল্পক্ষণেই এসে পৌঁছলো তাজ।

বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াতেই দু'জন অনুচর তাজকে অশ্বশালার দিকে নিয়ে গেলো।

বনহুর তাকালো নূরী আর জাভেদের দিকে।

জাভেদের হাতে তীর ধনু দেখে গম্ভীর হয়ে উঠলো বনহুরের মুখমণ্ডল।

নূরী বুঝতে পারলো জাভেদের হাতে তীর ধনু দেখে বনহুর ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

জাভেদ ছুটে গেলো পিতার পাশে জড়িয়ে ধরলো সে বনহুরের একখানা হাত—বাপু! আমার বাপু......

বনহুর ওকে আদর না করেই ওর হাতের মুঠা থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেলো আস্তানার দিকে।

নূরী আর জাভেদ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জাভেদের মুখখানা করুণ হয়ে উঠলো। নূরী একটু দাঁড়িয়ে থেকে তারপর ছুটে চললো আস্তানার অভ্যন্তরে।

বনহুর বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করে জামার বোতাম খুলতে খুলতে পায়চারী করছিলো।

নূরী প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

বনহুর ওকে দেখেও কোন কথা বললো না। জামার বোতাম খুলে জামাটা গা থেকে নিয়ে রাখলো আলনায় তারপর বিছানায় এসে বসলো।

নূরী বললো—হুর, তুমি আজ কি পাষাণ বনে গেছো। কথাটা বলে সে বনহুরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো তারপর বললো—জাভেদের সঙ্গে তুমি আজ অমন ব্যবহার করলে কেনো বলোতো?

বনহুর বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে একটি সিগারেট বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করলো। নূরীর কথায় কোন জবাব সে দিলো না।

নূরী অভিমান ভরা গলায় বললো—জানি না কি হয়েছে তোমার?

বনহুর আপন মনে তখন সিগারেট থেকে ধূম্র নির্গত করে চলেছে।

নূরী আড় চোখে তাকাচ্ছিলো বনহুরের দিকে। আজ সে বনহুরের মধ্যে নতুন এক ভাবের লক্ষণ লক্ষ্য করে মনে মনে বিচলিত হচ্ছিলো। যদিও নূরী বুঝতে পারছিলো জাভেদের হাতের তীর-ধনুই তাকে এমনভাবে গম্ভীর করে ফেলেছে তবু সে না বোঝার ভান করে বললো—কতদিন পর আস্তানায় এসেছো, জানিনা কি অপরাধ আমার? ক্ষমা করো হুর? নূরী হাত জুড়ে সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

একটু পূর্বে অভিমান ভরা নূরীর মুখভাব এবং একটু পরেই ক্ষমা চাইবার ভঙ্গী দেখে বনহুরের রাগ পড়ে গেলো, বললো—নূরী, আমি চাইনা আমার ছেলে আমার পথ অনুসরণ করুক।

নূরী এবার বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো। ওর চিবুকে হাত বুলিয়ে বললো—হুর কেনো তুমি মিছামিছি রাগ করো বলো তো? জাভেদের ধমনিতে যে তোমারই রক্ত কাজেই সে তোমার মত না হয়েই পারে না। তোমার ক্ষুদ্ধ মনভাব ওকে ব্যথা দেয় তা কি তুমি বোঝ না।

নূরী আমার অনুরোধ জাভেদকে তুমি আমার পথ অনুসরণ করতে দিও না।

হেসে বলে নূরী—আমি কেনো, কারো সাধ্য নেই জাভেদকে তার দুর্ধর্ষ স্বভাব-থেকে ফেরায়। হুর তুমি ওর চলার পথে বাধা দিও না। বলো, বলো হুর তুমি আর মিছামিছি রাগ করবে না ওর উপর? বলো?

বনহুর নীরব, কোন কথা সে বলে না।

নূরী বার বার বলে—জাভেদের উপর তুমি রাগ বা অভিমান করোনা। বলো রাগ করবোনা আর?

জানি নূরী রাগ করেও আমি পারবো না ওর চলার গতি রোধ করতে—তুমি যা বলছো সত্যি। রহমানও বলেছিলো জাভেদের স্বভাব কিছুতেই পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না।

তবে কেনো তুমি না বোঝার অভিনয় করো—বলো তো?

কি জানি, মন চায় না আমার ছেলে আমার মত নরপিশাচ হোক। ......

নূরী বনহুরের মুখে হাত চাপা দেয়—চুপ করো! তুমি নরপিশাচ এ কথা কে বলে? তুমি মহৎ মহান—তুমি মানুষ.........

নূরী! বনহুর নূরীকে আবেগে টেনে নেয় বুকে।

স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলে নূরী—দেশের প্রতিটি মানুষ যদি তোমার মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতো তা হলে দেশ আজ বেহেস্তে পরিণত হতো। অন্যায় নিঃশেষ হয়ে যেতো দেশ থেকে।

বনহুর নূরীর চিবুকটা তুলে ধরে, টেনে নেয় নিজের মুখের কাছে।

নূরী বলে উঠে—এখনও তোমার দুষ্টোমি গেলো না, ছেড়ে দাও কেউ এসে পড়বে।

উঁ হুঁ ছাড়বো না।

নূরী বনহুরের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য বলে—তুমি শহরে গিয়েছিলে, মনিরা আপা কেমন আছে তা তো বললে না?

নূরীর প্রশ্নে হেসে বলে বনহুর—ভাল আছে সে। নূরী একটা সংবাদ আছে যা তোমাকে এখনও বলা হয়নি।

কি সংবাদ?

গতকাল নূর বিদেশ যাত্রা করেছে।

তুমি বড় নিষ্ঠুর তাই এতোক্ষণও আমাকে কথাটা বলোনি? বিদেশে পাঠাবার পূর্বে আমাকে একবার ওকে দেখতেও দিলে না?

কোন উপায় ছিলনা নূরী।

জানি তুমি ঐ কথাই বলবে।

সত্যি বিশ্বাস করো আমি নিজেও ওকে বিদায় জানাতে পারিনি। দূর থেকে শুধু দেখেছি। সমস্ত বিমান বন্দর জুড়ে পুলিশ বাহিনী আমার প্রতিক্ষায় অপেক্ষা করছিলো। ওরা জানতো আমি সন্তানকে বিদায় জানাতে যাবো—থামলো বনহুর।

নূরীর চোখ দু'টো ছল ছল করছিলো। নূরকে সে ভালবাসতো নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি। একদিন নূরই তার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা ছিলো, মুহূর্তে ওকে না দেখলে সে বাঁচতো না। নূর ছিলো নূরীর হৃদয়ের ধন, চোখের মনি। শুধু মনিরার মুখের দিকে চেয়ে সে নূরকে ফিরিয়ে দিয়েছে, না হলে সে কোনদিন নূরকে দূরে সরিয়ে দিতে পারতো না।

নূরী বললো—কতদিন ওকে দেখতে পাবো না। না জানি ও কেমন আছে।

তুমি দোয়া করো নূরী ওর চলার পথ সুন্দর স্বার্থক হোক।

নূরী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—দোয়া করি আমার নূর যেন তার শিক্ষা শেষ করে ফিরে আসে। সফল হোক ওর সাধনা.......

বনহুর নূরীর ললাট থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বললো—তোমার আশীর্বাদ আল্লাহ কবুল করবেন। নূরী......

বলো?

নূরকে তুমি কত ভালবাসো, ভালবাসো ওর মাকে কিন্তু তোমার কথা আজও ওরা কেউ জানে না। ......একটু থেমে বললো বনহুর—হয়তো জানলে মনিরা তোমাকে সহ্য করবে না। নূরী, তাই আজও আমি তার কাছে তোমার কথা গোপন করে রেখেছি।

আমি জানি হুর, তুমি মনিরা আপার কাছে আজও আমার বিষয় নিয়ে কোন কথাই বলোনি কিন্তু কতদিন তুমি তার কাছে গোপন রাখবে আমাকে?

যতদিন মনিরা নিজে না জানতে চাইবে ততদিন আমি তোমাকে গোপন রাখবো তার কাছে। তারপর নূর ফিরে এলে একদিন তোমার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলবো সব কথা। তোমাকে ওর মার সঙ্গে......

না, না আমি চিরদিন গোপন থাকতে চাই। মনিরা আপার মনে আমি ব্যথা দিতে পারবো না হুর। আমি তা পারবো না.......

নূরী।

হাঁ হুর, তুমি মনিরা আপার মাথার মনি......

আর তোমার?

আমার হৃদয়ের রাজা।

বনহুর হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে তারপর হাসি থামিয়ে বললো—কার অধিকার বেশি বলো?

মনিরা আপার?

কারণ?

কারণ তাকে তুমি আগে ধরা দিয়েছো......

আর?

আমাকে গ্রহণ করেছো অনেক পরে। হুর, তুমি মনিরা আপার সম্পদ......আমার এমন সাহস নাই আমি তোমাকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেই।

নূরী তুমি আশ্চর্যই শুধু নও বিস্ময়কর।

তার চেয়েও বেশি তুমি কারণ তোমার পবিত্র ভালবাসা আমার সব বাসনা পূর্ণ করেছে। নূরী বনহুরের বুকে মাথা রাখলো।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নিলো কাছে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে বাইরে শোনা গেলো রহমানের কণ্ঠস্বর—সর্দার!

বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধ থেকে মুক্ত করে দিয়ে বলে—রহমান!

হাঁ সর্দার!

এসো।

রহমান ভিতরে প্রবেশ করে কুর্নিশ জানালো।

বনহুর বললো—কি সংবাদ রহমান?

সর্দার.......এই চিঠি কায়েস এনেছে।

চিঠি! কই দেখি? বনহুর হাত বাড়ালো।

রহমান একটি চিঠি বের করে বনহুরের হাতে দিলো।

বনহুর চিঠিখানা খুলে মেলে ধরলো চোখের সামনে, চিঠি খানায় দৃষ্টি পড়তেই বিস্মিত হলো সে। চিঠিতে লেখা আছে—

> "বনহুর, জানিনা এ চিঠি তোমার হাতে পৌছবে
> কি না। চীনা দস্যু—নাংচু-হুয়াং আমাকে বন্দী
> করেছে। আমি এখন হিয়াংচু দুর্গে বন্দিনী। তোমার
> পথ চেয়ে রইলাম।
>
> —আশা

বনহুর একবার নয় বার বার চিঠিখানা পড়লো। তারপর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—রহমান, কায়েস এ চিঠি কেমন করে পেলো এবং কোথায় পেলো সে?

রহমান বললো—কায়েস হিন্দল ঘাটি থেকে ফিরে আসার সময় একটি লোক তাকে ঐ চিঠিখানা দেয়। চিঠিখানা দেবার পর সে দ্রুত চলে গিয়েছিলো তাই কায়েস তাকে আর দেখতে পায় নি বা কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেনি।

বনহুরের ভ্রু-কুঞ্চিত হয়ে উঠলো,। সে পুনরায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো চিঠিখানার দিকে। বললো সে—আশার চিঠি কি করে সেই লোকটির হাতে এলো? লোকটিকে পেলে আমার উদ্ধার ব্যাপার অনেকটা সহজ হতো?

রহমান বললো—সর্দার কায়েস বলেছে, সে চিঠিখানা তার হাতে দিয়েই বিদায় নিয়েছে। কায়েস চিঠিখানা পড়বার সুযোগ না করতেই সে উধাও। কাজেই......

হাঁ বুঝতে পেরেছি! একটু থেমো বললো বনহুর—যে লোকটি আশার চিঠি বহন করে এনেছিলো সে নিশ্চয়ই নাংচু-হুয়াং এর দলের লোক এবং সে কায়েসকেও ভালভাবে জানে—সে আমার দলের লোক।

সর্দার ঠিক বলেছেন, না জানলে সে কিছুতেই কায়েসকে ও চিঠি দিতো না।

রহমান তুমি হিন্দল চলে যাও এবং সঙ্গে কায়েসকে নিয়ে যাও। কায়েস নিশ্চয়ই তাকে চিনতে পারবে সে সেই লোক যে তার হাতে চিঠিখানা দিয়েছিলো। আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি, আমাকে পুনরায় হাজরায় যেতে হবে। হাজরা গ্রামে ভয়ানকভাবে অন্যায় অনাচার চলেছে। হাজরার অধিনায়ককে শায়েস্তা না করা অবধি আমি স্থির হতে পারি না।

কিন্তু আশার যদি কোন বিপদ ঘটে যায়? সর্দার, সে নিশ্চয়ই ভয়ানক বিপদগ্রস্থ......

হাঁ, আমারও সেই রকম মনে হচ্ছে। তবে আমার হাজরায় একবার যেতেই হবে। হাজরা থেকে ফিরে এসে আমি চীন অভিমুখে রওয়ানা দেবো।

আচ্ছা সর্দার তাই হবে। রহমান বেরিয়ে গেলো।

নূরী এতোক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে শুনছিলো রহমান ও বনহুরের কথাগুলো। এবার সে প্রশ্ন করে বসলো—আশা! কে সেই আশা?

ভালোভাবে স্মরণ করো ঠিক্ চিনতে পারবে।

না, আমি কিছুতেই খেয়াল করতে পারছি না। আশা কে সে?

আমার একজন হিতাকাঙ্খিনী......বহুবার সে আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছে। শোন, তার আর এক নাম ছিলো, ঐ নাম হয়তো তোমার স্মরণ আছে—ইরানী।

ইরানী?

হাঁ।

আমি ইরানীকে চিনি, চোখে তাকে না দেখলেও তার নাম শুনেছিলাম রহমানের মুখে।

হাঁ, এই আশাই হলো ইরানী। নূরী পড়ে দেখো এই চিঠিখানা।

নূরী বনহুরের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়ে ফেললো এক নিশ্বাসে, তারপর বললো—আশা চীনা দস্যু কবলে বন্দিনী। তোমার সাহায্য কামনা করে সে লিখেছে। হাজরার কাজের চেয়ে তোমার কর্তব্য তাকে উদ্ধার করা কারণ সে বহুবার তোমার জীবন রক্ষা করেছে।

নূরী, আশাকে চীনা দস্যু কবল থেকে উদ্ধার করা আমার কর্তব্য জানি কিন্তু তার চেয়ে বেশি কর্তব্য হাজরাবাসীকে উদ্ধার করা। কথাটা বলে বনহুর একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো। পুনরায় বালিশে ঠেশ দিয়ে বসলো সে শয্যার উপরে।

নূরী বললো—হাজরার সব কথা আমি শুনেছি।

শুধু হাজরা গ্রামের নয় এমনি শত শত শহর গ্রাম বন্দর নানা অন্যায় অনাচারে ভরে উঠেছে। নানারকম কুৎসিত কাজ চলেছে দেশের অভ্যন্তরে। মানুষ হয়ে মানুষের রক্ত শোষণ করে নিচ্ছে একদল রক্ত শোষক......

রক্ত শোষক।

হাঁ।

সে কি রকম?

ঠিক মানুষের মত।

মানুষের মত তারা দেখতে, বলো কি!

হাঁ, তারা কারা জানো দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তারাই এখন দেশ রক্ষক বলা যায়—মুখে বড় বড় বুলি আওড়ায়, পত্র পত্রিকায় তাঁদের মহত্ত্বের কথা ছাপা হয়, তারা জনদরদী সেজে জনগণের বুকের রক্ত শোষণ করে......

খিল খিল করে হেসে উঠে নূরী তারপর হাসি থামিয়ে বলে—তুমি যাদের কথা বলছো আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি।

সত্যি?

হাঁ—বলবো কারা তারা?

বলো?

যারা তেলায় বসে ফিরনী, পোলাও আর সুধা পান করে। যাদের দেহে ঝলমলে পোশাক পরিচ্ছদ......যাদের মেঝেতে বিছানো থাকে লক্ষ টাকা মূল্যের গালিচা......যাদের সদর গেটে রাইফেল ধারী প্রহরী পাহারায় রত......যাদের পায়ের কাছে বসে জিভ বের করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বুল ডগ—তারাই হলো জনগণের রক্ত চোষা শার্দ্দুল।

নূরী! বনহুর আনন্দ ধ্বনি করে নূরীর পিঠ চাপড়ে দেয়—সাবাস, তুমি দেখছি সব জানো।

জানবো না, দেশের কে না এদেরে চেনে। সবাই জানে কারা দেশের জনগণের রক্ত শোষণ করে নিচ্ছে। কাদের চক্রান্তে দেশ আজ সর্বনাশের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। কারা তারা, এ কথা দেশবাসীকে কেউ বা কাউকে বলে দিতে হয় না। জনগণের রক্ত যারা শোষণ করছে, জনগণ এবার তাদের রক্ত শোষণ করবে অচিরে সেদিন ঘনিয়ে আসছে বুঝলে হুর।

নূরী!

হাঁ হাঁ হুর মনে করেছো তুমি একাই সব সংবাদ জানো আর তুমি একাই সবাইকে শায়েস্তা করছো—না তা নয়।

নূরী!

হাঁ হুর, দেশের জনগণ যখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে, ক্ষুধা পিপাসায় মানুষ যখন উন্মাদ। পথে ঘাটে মৃত্যুর স্তূপ, ডাষ্টবীন আর নর্দমায় যখন কঙ্কাল সার নারী-পুরুষ খাদ্যের সন্ধানে হাতড়ে ফিরছে তখন কি কেউ চুপ থাকতে পারে।

এ সব কি বলছো নূরী?

যাও হুর, তুমি আশাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসো তারপর দেশে দুষ্টো দমন করো।

কিন্তু......

কোন কিন্তু নয় যাও।

এ তুমি কি বলছো নূরী?

হাঁ, আমি জানি, আশার জন্য তুমি আজও জীবনে বেঁচে আছো, আশা তোমার প্রাণ রক্ষাকারিনী। তবে আশা নামে তাকে আমি জানতাম না, জানতাম ইরানী নামে। হুর, তুমি তৈরি হয়ে নাও চীন অভিমুখে যাত্রা করতে হবে।

নূরীর কথা ফেলতে পারে না বনহুর, যদিও তার মনে তখন হাজরা গ্রামের চিন্তা ভাসছিলো। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছিলো গোলাপী বৌ-এর কথা। মাত্র ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিলো মালেক মিয়া তারপর কেটে গেছে এক সপ্তাহের বেশি। কত কাজ পড়ে রয়েছে সেখানে। নূরীর অনুরোধ অবহেলা করতে পারে না সে। চীন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়।

❑

চীনা দস্যু নাংচু-হুয়াং, যেমন তার চেহারা তেমনি সে শক্তিশালী। তার দস্যুতা শুধু চীন রাজ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সে বেশির ভাগ দস্যুতা সাধন করে পৃথিবীর দক্ষিণ পূর্ব অংশে।

চীন রাজ্যে সে বাস করে, বছরের সমস্ত দিনগুলো কাটে তার বিভিন্ন রাজ্যে। দস্যুতা করে নাংচু-হুয়াং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হবার স্বপ্ন দেখছিলো।

নাংচু-হুয়াং যখন পৃথিবীর দক্ষিণ অংশে রায়হান বন্দরে তার জাহাজখানাকে নঙ্গর করিয়েছিলো তখন দস্যুরাণী হ্যানরী জানতে পারে এবং সে গোপনে অনুচরদের নিয়ে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে—চীনা দস্যু নাংচু-হুয়াংকে শায়েস্তা করার জন্য।

দু'দিন গোপনে অপেক্ষা করার পর নাংচু রায়হান বন্দর ত্যাগ করে।

দস্যুরাণী তখন সখীদের নিয়ে কোন এক উৎসবে মত্ত ছিলো। দস্যুরাণীর একজন অনুচর এসে জানালো নাংচু-হুয়াং রায়হান বন্দর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। সে শুধু রায়হান বন্দর ত্যাগ করেই যাচ্ছে না যাবার পূর্বে রায়হান বন্দর থেকে প্রচুর ধন সম্পদ হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

দস্যুরাণী কথাটা শুনা মাত্র ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো এবং তার অনুচর রহমতকে জানিয়ে দিলো—রহমত তুমি আমার জাহাজ প্রস্তুত করো। নাংচু-হুয়াং আমার এলাকা থেকে সম্পদ নিয়ে পালাবে এ আমি সহ্য করবো না। নাংচুর জাহাজ যখন মধ্য সাগরে গিয়ে পৌঁছবে তখন আমি তার জাহাজ আক্রমণ করবো।

রহমত সসম্মানে জানালো—আচ্ছা রাণীজী, আমরা সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রওয়ানা দিবো।

নাংচু-হুয়াং এর জাহাজ রায়হান বন্দর ত্যাগ করে এগিয়ে চললো। হুয়াং এর অনুচরদের আনন্দ আর ধরছে না। হুয়াং নিজেও বোতলের পর বোতল নেশা পান করে চলেছে। রায়হান বন্দর থেকে মূল্যবান সামগ্রি হরণ করেছিলো তারা।

দস্যুরাণী এ সংবাদ জানতে পেরেছিলো এবং এ জন্যই সে বেশি ক্রুদ্ধ হয়েছিলো। তার দেশের সম্পদ বিদেশী দস্যু এসে নিয়ে যাবে এটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না তাই দস্যুরাণী তার অনুচরদের নিয়ে রওয়ানা দিলো।

দস্যুরাণীর জাহাজখানা যদিও খুব বড় ছিলো না, কিন্তু তার গতিছিলো অত্যন্ত—দ্রুত। হুয়াং এর জাহাজখানাকে ফলো করে এগিয়ে গিয়েছিলো মাঝ সাগরে এবং সুযোগ বুঝে আক্রমণ করেছিলো দস্যুরাণী হুয়াং এর জাহাজখানাকে।

সুচতুরা দস্যুরাণীর আক্রমণে হুয়াং বেকুফ বনে গিয়েছিলো, শেষ পর্যন্ত পরাজয় ঘটেছিলো তার দস্যুরাণীর কাছে। দস্যুরাণী হুয়াংএর জাহাজ থেকে তার সমস্ত সম্পদ হরণ করে রায়হান বন্দর থেকে যে মূল্যবান সম্পদ হুয়াং লুট করেছিলো ঐ মালামাল দস্যুরাণী ছিনিয়ে নিয়ে চীনাদস্যু নাংচু-হুয়াংকে মুক্তি দিয়েছিলো।

নাংচু-হুয়াং দস্যুরাণীর কাছে মুক্তি পেলেও সে খুশি হলো না। তার ধমনিতে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিলো। সে তার দলবলকে আদেশ দিলো দস্যুরাণীকে আটক করার জন্য।

নাংচু-হুয়াং এর অনুচরগণ জাহাজ নিয়ে ছুটলো দস্যুরাণীর জাহাজখানাকে আটক করার জন্য। কিন্তু হুয়াং এর অনুচরদের ক্ষমা কি দস্যুরাণীর জাহাজ আটক করে। কৌশলে সে জাহাজ খানা হুয়াংএর অনুচরদের দৃষ্টি আড়ালে চলে গিয়েছিলো।

দস্যুরাণীর জাহাজের সন্ধানে নাংচু-হুয়াং উন্মাদ হয়ে উঠে, রায়হান বন্দর এবং আশেপাশে সমস্ত জাহাজগুলোতে তারা রীতিমত খোঁজ করে নানা ছদ্মবেশে। তবু তারা দস্যুরাণী বা তার জাহাজের সন্ধান পায় না। নাংচু জাহাজ নিয়ে প্রতিটি বন্দরে সন্ধান চালায়। সাগরের তীরে বিভিন্ন জায়গায় জাহাজ থামিয়ে সন্ধান করে দস্যুরাণীর। এ ব্যাপারে নাংচুর বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়। বিভিন্ন দ্বীপে সন্ধান চালাতে গিয়ে জংলীদের সঙ্গে নাংচুর দলবলদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে নিহত হয় নাংচুর বহু অনুচর।

এক সময় নাংচুর জাহাজ ঝাম সাগরে এসে পৌঁছায়। ঝাম রাজ্যে তারা তল্লাসি চালায় দস্যুরাণীর জন্য। চীনাদস্যু হুয়াং ঝাম রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে সন্ধান করে চলে।

একদিন এক সরাইখানায় হুয়াং জানতে পারে—দস্যুরাণী বাস করে ঝাম জঙ্গলে। বহু টাকার বিনিময়ে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে এক ঝাম অধিবাসী।

হুয়াং ভাবতেও পারেনি এতো সহজে তারা দস্যুরাণীর সন্ধান পাবে। মনে মনে ভীষণ খুশি হয় নাংচু-হুয়াং। যে দস্যুরাণী তার মূল্যবান সম্পদ কেড়ে নিয়েছে—যে দস্যুরাণী তাকে নাকানী চুবানী খাইয়েছে, সেই দস্যুরাণীকে সে এতো আলগোছে পেয়ে গেলো। ঝাম অধিবাসী বললো—আমি কিন্তু আপনাকে দূর থেকে দস্যুরাণীর আস্তানা দেখিয়ে দিয়ে চলে আসবো।

বলেছিলো নাংচু-হুয়াং—বেশ তাই হবে। তার জন্য তোমাকে পুরস্কার দেবো পাঁচ হাজার টাকা।

লোকটা খুশি হয়েছিলো অনেক, পাঁচ হাজার টাকা সে পাবে তার বিনিময়ে শুধু একটু কষ্ট করে, দস্যুরাণীর পথটা দেখিয়ে দেবে।

নাংচু নিজে ছদ্মবেশে ছিলো আর তার দলবল আত্মগোপন করেছিলো ঝাম শহরে। নাংচু নিজে চললো লোকটার সঙ্গে। ভাবলো, আগে নিজের চোখে দেখে আসবে তারপর অনুচরদের নিয়ে রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করবে দস্যুরাণীর আস্তানা।

লোকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

তার সঙ্গে চলেছে নাংচু-হুয়াং।

নাংচু-হুয়াং এর শরীরে ঝাম অধিবাসীদের পোশাক। কাঁধে ঝুড়ি, হাতে থলে। দেখলে মনে হয় তারা জঙ্গলে ফলের সন্ধানে এসেছে। নাংচু বেটে-সেটে বলিষ্ঠ চেহারা, নাক চেপটা, গোঁফ দুটো প্রায় ইঞ্চি তিন লম্বা, ঝুলে নেমেছে ঠোঁটের দু'পাশে। চোখ দুটো ক্ষুদে ধরণের হলেও তাতে শ্যাম পাখির দৃষ্টি। শার্দুলের চোখের মত ও বলা যেতে পারে।

নাংচু যতই এগুচ্ছে ততই পথটা যেন আরও স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে। আশ্চর্য হচ্ছে নাংচু-হুয়াং কারণ দস্যুরাণীর আস্তানার পথ এতো পরিষ্কার হতে পারে এ যেন চিন্তার বাহিরে।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটানা হেঁটে একসময় তারা দু'জন ঝাম জঙ্গলের অভ্যন্তরে পৌঁছে গেলো। বিরাট জঙ্গলে আত্মগোপন করে হুয়াং- এসে গেছে কিন্তু আশ্চর্য বটে লোকটা মোটেই ভয় পাচ্ছে না। সে হুয়াংকে নিয়ে বেশ ফূর্তি করেই চলেছে।

বেলা কতখানি হলো তেমন বোঝা যাচ্ছে না। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ডাল-পালার ফাঁকে-ফাঁকে রোদ এসে মাটি স্পর্শ করছিলো। জঙ্গল হলেও তেমন ভয়ঙ্কর জীবজন্তুও নজরে পড়লো না হুয়াং এর। দস্যুরাণীকে এতো সহজে পাবে এ যেন ধারণার অতীত।

এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো হুয়াং, সে তার সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বললো—তুমি তো আমাকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছো না।

লোকটা জিভ কেটে বললো—আরে না না ভুল পথ হবে কেনো! এ পথে আমি কি আজ নতুন এসেছি এর আগে ক'বার এসেছি।

আশ্চর্য হয়ে বললো হুয়াং—কেনো তুমি এ পথে এসেছিলে আরও ক'বার?

ও তুমি বুঝি জানো না দস্যুরাণী পুর্ণিমা রাতে দু'হাত উজার করে গরিবদের মধ্যে তার ধন সম্পদ বিলিয়ে দেয়। আমরা তাই পূর্ণিমা রাতে এ জঙ্গলে আসি...।

নাংচুর চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠে, বলে তাই নাকি দস্যুরাণী পূর্ণিমা রাতে তার ধন সম্পদ দু'হাত ভরে দান করে?

হাঁ, তুমি জানো না?

না জানি না। জানি না বলেই তো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম পথ চিনে নেবার জন্য।

আরও কিছুটা চলার পর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটা, সে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলে ঐ যে কুড়ে ঘরটা দেখছো ওখানেই বাস করে দস্যুরাণী।

নাংচু-হুয়াং এর চোখ জ্বলে উঠেছিলো, আর রক্ষা নাই দস্যুরাণীর, এবার কে তাকে বাধা দেয় দস্যুরাণীর সন্ধান সে পেয়ে গেছে।

নাংচু লোকটাকে সঙ্গে করে ফিরে এসেছিলো আবার সেই সরাইখানায়। লোকটাকে গুণে গুণে পাঁচ হাজার টাকা বখশীস দিলো তারপর রাত্রির জন্য প্রতিক্ষা করতে লাগলো।

এক সময় রাত বেড়ে এলো।

পূর্ব হতেই নাংচু-হুয়াং তার অনুচরদের অস্ত্রে সস্ত্রে প্রস্তুত হয়ে নিতে বলছিলো। দলপতির আদেশ মত তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিলো। রাত বেড়ে আসতেই নাংচু-হুয়াং অনুচরদের নিয়ে রওয়ানা দিলো ঝাম জঙ্গল অভিমুখে।

পথ তার দিনের আলোতে চেনা হয়ে গিয়েছিলো তাই কোন অসুবিধা হলো না। দ্রুত পা চালিয়ে তারা এক সময় পৌছে গেলো সেই দূর থেকে দেখা কুঁড়ে ঘরখানার অদূরে।

হুয়াং তখন দূর থেকে দস্যুরানীর আস্তানা দেখে বিস্মিত হয়েছিলো কারণ যে দস্যুরাণীর দাপটে পৃথিবীর বহু অংশ প্রকম্পিত, সেই দস্যুরাণীর আস্তানা একটি কুড়েঘর মনে মনে হুয়াং হেসেছিলো কিছুক্ষণ। তবে সঙ্গী লোকটা যেন কিছু বুঝতে না পারে সেজন্য ছিলো সে সচেতন। দস্যুরাণীর কুঠির বা কুঁড়ে ঘর তাকে আরও সাহসী করে তুলেছিলো। দস্যুরাণীকে গ্রেপ্তার করা তার পক্ষে মোটেই অসুবিধা হবে না।

গভীর রাত্রির অন্ধকারে হুয়াং দলবল নিয়ে সেই কুঁড়েঘর ঘিরে ফেললো। চারিদিকে অনুচরদের অস্ত্র-সস্ত্রে সুসজ্জিত রেখে নিজে কুঁড়েঘরে প্রবেশ করলো। সে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে দেখলো—দস্যুরাণী শুভ্র বসন পরিহিত অবস্থায় আসনে উপবেশন পূর্বক নিশ্চুপ বসে আছে। চোখ দুটো তার মুদিত এলায়িত কেশ রাশি ছড়িয়ে আছে পিঠে কাঁধে।

গলায় ফুলের মালা, বাজুতে ফুলের বালা, সম্মুখে ফুলের ডালায় স্তূপকৃত ফুল। ভালভাবে হুয়াং তাকিয়ে দেখলো দস্যুরাণীর সামনা সামনি দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক। যুবকটি জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না। কারণ তার দৃষ্টি স্থির ছিলো, আর স্থির ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে সে।

দস্যুরাণীর দু'চোখ মুদে থাকায় সে দস্যু হুয়াংকে দেখতে পায় না। হুয়াং আলগোছে পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। ধুপের ধোয়ায় কক্ষটা ধুমায়িত ছিলো। সে বুঝতে পারে সম্মুখে দন্ডায়মান লোকটি আসলে জীবিত কোন মানুষ নয়, একটি মূর্তি।

নাংচু-হুয়াং হাতে তালি দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের আশে-পাশে থেকে নাংচুর দলবল প্রবেশ করে কক্ষের মধ্যে।

নাংচু-হুয়াং তখন দস্যুরানীকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। দলবল দলপতির আদেশ পাওয়া মাত্র শুভ্র বসনা দস্যুরাণীকে ধরে ফেলে এবং তার হাত, পা ও মুখ বেঁধে তুলে নেয় কাঁধে।

শুভ্র বসনা ছিলো রাণী দুর্গেশ্বরী।

যে মুহূর্তে নাংচু-হুয়াং তাকে গ্রেপ্তার করে তখন রাণী তন্ময় ছিলো তার সাধনায়, তাই সে টের পেলো না কিছু। যখন তার হাত, পা ও মুখ বেঁধে কুঠিরের বাইরে নিয়ে এলো তখন আশা সেখানে উপস্থিত হলো। আশা মাঝে মাঝে এখানে আসতো, মিলিত হতো সে রাণী দুর্গেশ্বরীর সঙ্গে।

দুর্গেশ্বরী একদিন দস্যুনেত্রী বা দস্যুরাণী ছিলো, তার দাপটে কম্পমান ছিলো ঝাম থেকে হিন্দল রাজ্য পর্যন্ত। আরও বহু জায়গায় ছিলো তার আস্তানা।

দুর্গেশ্বরীর স্বামী মহারাজ জানতেন না তার স্ত্রী একজন দস্যুনেত্রী। মহাসুখে দিন কাটছিলো মহারাজের। রাণী গভীর রাত্রে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যেতো তার আস্তানায়। দস্যুতা করতো সে দলবল নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়।

দস্যুতা শেষ করে ফিরে আসতো রাণী এবং রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতো। পরদিন রাজ-দরবারে মহারাজের পাশে যখন বসতো গিয়ে তখন কেউ ভাবতোনা এই মহারাণী একজন দস্যুনেত্রী বা দস্যুরাণী।

প্রজারা আসতো নানা নালিশ নিয়ে।

আসতো রাতের দস্যুতা ব্যাপার নিয়ে, কেবা কারা তাদের সর্বস্ব হরণ করে নিয়ে গেছে। তারা অসহায় হয়ে পড়েছে, সব হারিয়ে পথে বসেছে তারা।

রাণী দুর্গেশ্বরী মনে মনে হেসেছে, হৃদয়ে আনন্দ উপভোগ করেছে।

মহারাজ ঘোষণা করে দিয়েছে—কে সেই দস্যুনেত্রী যে তার রাজ্যে এমনভাবে দস্যুতা করে চলেছে। তার রাজ্যে অশান্তির হাওয়া বইয়ে

দিয়েছে। যে দস্যুরাণীকে গ্রেপ্তার করতে পারবে তাকে পুরস্কার দেবেন তিনি তাঁর কণ্ঠের হীরক হার।

এ সংবাদ এক সময় পৌঁছে গিয়েছিলো বনহুরের কানে। হীরক হারের লোভে নয়, কে সেই দস্যুরাণী জানার বাসনায় সে এসেছিলো এই রাজ্যে এবং রাজপ্রাসাদে সে চাকুরি নিয়েছিলো কর্মচারী হিসাবে।

প্রথম নজরেই রাণী দুর্গেশ্বরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো বনহুর, তারপর ওর হৃদয় করেছিলো জয়। একদিন দুর্গেশ্বরী তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেললো।

রাণী দুর্গেশ্বরীই যে দস্যুরাণী বা দস্যুনেত্রী—দু'দিনেই জেনে নিয়েছিলো বনহুর এবং তা প্রমাণ করেছিলো রাজদরবারে।

রাণী দুর্গেশ্বরী পরাজয় বরণ করেছিলো সেদিন বনহুরের কাছে এবং কথা দিয়েছিলো আর সে দস্যুতা করবে না এবং তার দস্যুতার সঞ্চিত সম্পদ সব সে বিলিয়ে দেবে দুঃস্থ জনগণের মধ্যে। শুধু সে চায় বনহুরের ধ্যান করার অধিকার।

বনহুর হেসে বলেছিলো, বেশ তাই হোক।

দুর্গেশ্বরী সেই হতে গহন জঙ্গলে কুঁড়েঘরে বাস করতো এবং নিজের ধন সম্পদ সব বিলিয়ে দিতো গরিব দুঃখীদের মধ্যে।

রাজ্যের সবাই তাই জানতো দস্যুরাণী তার দস্যুতা ত্যাগ করে এখন সন্ন্যাসিনী বনে গেছে।

ঝাম অধিবাসী লোকটি তাই দস্যুরাণীর নাম শুনে রাণীদুর্গেশ্বরীর কুঠিরের সন্ধান দিয়েছিলো।

রাণীদুর্গেশ্বরীর সঙ্গে আশার পরিচয় ঘটেছিলো একদিন আচম্বিতে। আশা অশ্বযোগে ঝাম জঙ্গল অতিক্রম করার সময় সে দেখেছিলো সম্মুখে এক কুঁড়েঘর। সে ঐ কুঁড়েঘরে প্রবেশ করে চমকে উঠেছিলো। তার চমকে উঠার কারণ কুঁড়ে-ঘরের মধ্যে সে দেখতে পেলো একটি বিরাট আকার ছবি। ছবিখানা দেখে সে বিস্মিতই শুধু হলো না হলো অত্যাশ্চর্য, কারণ ছবির মানুষটিকে সে যে গভীরভাবে ভালবাসে, কামনা করে। এ ছবি এখানে এলো কি করে। আশা যখন অশ্ব বাইরে রেখে কুঁড়ে-ঘরে প্রবেশ করেছিলো তখন সেখানে কেউ ছিল না।

রাণীদুর্গেশ্বরী তখন বাইরে ফুল সংগ্রহে গিয়েছিলো। ফুল নিয়ে সে ফিরে আসে কুঁড়েঘরে।

পদশব্দ পেয়ে আশা লুকিয়ে পড়েছিলো ছবির আড়ালে।

দুর্গেশ্বরী প্রবেশ করে কুঁড়েঘরে, হাতে তার ফুলের ডালা।

আড়ালে আত্মগোপন করে দেখে আশা সবকিছু।

রাণীদুর্গেশ্বরী ফুল নিয়ে ছবির পাদমূলে রাখে, তারপর সে দু'চোখ মুদে বসে ধ্যান গ্রস্তের মত। সম্মুখে ধুপদানী থেকে ধুম্ররাশি কুন্ডলি পাকিয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারপাশে।

আশা অবাক হয়ে যায়।

এরপর থেকে প্রায়ই আশা আসতো এ জঙ্গলে! সে আড়ালে আত্মগোপন করে দেখতো রাণীদুর্গেশ্বরীর কার্যকলাপ, দেখতো তার যোগ সাধনা।

অন্যান্য দিনের মত আজও আশা রাতের অন্ধকারে এসেছিলো এ জঙ্গলে। ছবির আড়ালে আত্মগোপন করেছিলো সে। এমন সময় নাংচু-হুয়াং রাণী দুর্গেশ্বরীকে পিছন থেকে আক্রমণ করে এবং তাকে বেঁধে ফেলে মজবুত করে।

দুর্গেশ্বরী আচমকা আক্রমণে হতবাক হয়ে পড়েছিলো। সে কিছু বুঝবার পূর্বেই তাকে বেঁধে ফেলা হয় এবং কুঠিরের বাইরে বের করে আনে নাংচু-হুয়াং এর অনুচরগণ।

আশা আড়াল থেকে সব দেখছিলো। সে এ মুহূর্তে নিশ্চুপ থাকতে পারে না, আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। অস্ত্র তার সঙ্গেই ছিলো ভীষণভাবে আক্রমণ করে সে হুয়াং-এর অনুচরদের।

আশার শরীরে ছিলো দস্যুরাণীর ড্রেস।

কতকটা শিকারীদের পোশাকের মত। মাথায় ছিলো ক্যাপ, কোমরে পিস্তল।

হুয়াং নিজে আড়ালে ছিলো।

আশার সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছিলো হুয়াংএর অনুচরদের। হুয়াং দেখলো যাকে গ্রেপ্তার করে নিয়েছে সে নিশ্চয়ই দস্যুরাণী নয়, দস্যুরাণী ঐ তরুণী যে তার অনুচরদের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।

রাণীদুর্গেশ্বরী তখন হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় একপাশে পড়েছিলো, সেও কম অবাক হয়নি কে এই নারী যে তাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করে চলেছে।

আশা যখন নাংচু-হুয়াং এর অনুচরদের পরাজিত করে দূর্গেশ্বরীর বন্ধন উন্মোচন করতে যাচ্ছিলো ঠিক ঐ মুহূর্তে নাংচু নিজে পিস্তল চেপে ধরলো আশার পিঠে।

আশা মনে করেছিলো সবাই পালিয়েছে তাই সে নিজ অস্ত্র কোমরের বেল্টে রেখে দুর্গেশ্বরীর হাত-পার বাঁধন মুক্ত করে দিতে গিয়েছিলো। কিন্তু সে দুর্গেশ্বরীর হাত-পা এর বাঁধন খুলে ফেলতে সক্ষম হলো না, বাধ্য হলো সে হাত দু'খানা তুলে আত্মসমর্পন করতে।

ফিরে তাকাতেই হুয়াংকে দেখে মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো আশা। সে হুয়াংএর বিকট চেহারা দেখে অবাক হলো প্রথমে। পরক্ষণেই যেমন সে কোমর থেকে অস্ত্র খুলে নেবার জন্য হাত নামিয়েছে অমনি হুয়াং অনুচরদের ইঙ্গিৎ করলো—সঙ্গে সঙ্গে অনুচরগণ চারপাশ থেকে ঘিরে ফেললো আশাকে।

হুয়াং নিজ হাতে আশার হাত দু'খানায় শিকল পরিয়ে বেঁধে ফেললো।

আশাকে বেঁধে নিয়ে চললো নাংচু হুয়াং এর দল—দুর্গেশ্বরী মুক্তি পেলো।

আশাকে রাতের অন্ধকারে হাত-পা ও মুখ বেঁধে জাহাজে নিয়ে এলো। ভোর হবার পূর্বেই জাহাজ ছাড়লো হুয়াং ঝাম বন্দর থেকে।

❑

আশাকে যে ক্যাবিনে আটক করে রাখা হলো সেই ক্যাবিনের পাশেই ছিলো নাংচু হুয়াংএর প্রমোদ কক্ষ বা ক্যাবিন।

ক্যাবিনে বসে ওরা খুব আমোদ-ফুর্তি করে চললো। কারণ ওরা দস্যুরাণীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে—এটাই তাদের আনন্দের কারণ।

আশা কিন্তু তার ক্যাবিনে বসে সব শুনতে পাচ্ছিলো এবং একটি ফুটো ছিলো। সেই ফুটো দিয়ে সব দেখছিলো—সুরাপান করে সবাই চীনা ভাষায় নাচ গান শুরু করে দিলো।

আশা বুঝতে পারলো এরা দস্যু ছাড়া আন্য কিছু নয় এবং রাণীদুর্গেশ্বরীকে হরণ করবার জন্যই এরা ঝাম জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলো। কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করা সত্যও ওরা মুক্তি দিয়ে আশাকে আটক করে নিয়ে চলেছে। ভাবে আশা, কে এরা আর এদের উদ্দেশ্যই বা কি?

জাহাজ তিন সপ্তাহকাল সমুদ্র বক্ষে বিচরণ করার পর একদিন এসে নোঙ্গর করলো। আশা বুঝতে পারলো এটা কোন বন্দর নয়, কোন এক দ্বীপ অঞ্চলের নির্জন স্থানে নোঙ্গর করেছে জাহাজখানা।

আশাকে জাহাজ থেকে যখন নামানো হলো তখন তার মুখ বেঁধে দেওয়া হলো। হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা কিন্তু পা দু'খানা তখন মুক্ত রয়েছে।

জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে যখন লুণ্ঠিত মালামালগুলো নামানো হচ্ছিলো তখন আশাকেও নামানো হলো লুট করা মালের মত অবস্থায়।

আশা কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছে না। তাকে দু'জন চীনা দস্যু নামিয়ে আনলো জাহাজ থেকে নিচে। আশা যে ক'দিন হুয়াংএর জাহাজে আটক ছিলো সে ক'দিন কেউ তাকে বিরক্ত করেনি এমনকি হুয়াং পর্যন্ত যায়নি তার ক্যাবিনে। আশা সেজন্য অনেকটা আশ্বস্ত ছিলো। শুধু খাবার সময় একটা চীনা বৃদ্ধ এসে তাকে খাবার দিয়ে যেতো। খাবারের মধ্যে অনেক খাবার আশা খেতে পারেনি। সাপ, ব্যাঙ আরও অদ্ভুত জীবের শুকনো কাবাব তৈরি করতো তাই তারা আশাকে খেতে দিতো।

আশা ওসব খেতো না, সে শুধু শুকনো রুটী আর শুকনো মাংস খেতো। বৃদ্ধটি আশাকে খাবার দিতে এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি ভাষায় কথা বলতো। আশা অনেক কিছু খেতো না, পড়ে থাকতো পাতে। বৃদ্ধ বলতো—তুমি এসব কোনদিন স্পর্শ করো না কেনো?

আশা বলতো—ওসব আমরা খাইনা।

বৃদ্ধ বললো—না খেলে বাঁচবে কি করে? ওসব আমাদের প্রিয় খাদ্য।

আশা বৃদ্ধের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছিলো। সে তার কাছে অনেক কিছু জানতেও পেরেছিলো কথায় কথায়। যদিও সব কথা আশা বুঝতোনা তবু সে যা বুঝতো তাই তার পক্ষে ছিলো যথেষ্ঠ।

আমাকে ওরা চোখ বেধে নিয়ে এলো, কোথায় সে জানে না। সুড়ঙ্গ পথে সিঁড়ি দিয়ে নামানো হচ্ছে সে বেশ উপলব্ধি করলো। অনেকটা পথ এগিয়ে গেলো তারপর এক সময় চোখের বাঁধন খুলে দিলো ওর।

চোখ মুক্ত হওয়ায় আশা দেখলো আধো অন্ধকারময় একটি সুড়ঙ্গ পথ। দু'জন বেটে মত লোক তার দু'হাতে ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। দু'পাশে পাথরের প্রাচীর। সরু সুড়ঙ্গ পথে চলতে গিয়ে মাঝে মাঝে মাথা ঠুকে যাচ্ছিলো তার।

একটা প্রশস্ত কক্ষের মত জায়গায় এসে থামলো ওরা। আমার হাত দু'খানা তখনও বাধা ছিলো তাই অসুবিধা হচ্ছিলো।

একজন চীনা ভাষায় কি যেন বললো।

অপরজন তার জবাব দিলো।

আশা কিছু ববুঝতে পারলো না।

প্রথম ব্যক্তি এবার এগিয়ে এসে হাতের বাঁধন উন্মোচন করে দিলো। তাকে সেই কক্ষমধ্যে আটক করে রেখে চলে গেলো চীনা দস্যুদ্বয়।

আশা ইচ্ছা করলে বাধা দিতে পারতো বা পালাবার চেষ্টা করতে পারতো কিন্তু সে তা করলো না, কারণ কোথায় পালাবে এ যে তার সম্পূর্ণ অজানা অচেনা জায়গা। তাছাড়া এটা কোন দূর্গ বা ভূগর্ভ সুড়ঙ্গ কক্ষ। এখানে কোথায় কোন পথ সে জানে না। ধৈর্য ধরে কৌশলে কাজ করতে হবে। আশা বসে বসে ভাবছে রাণী দুর্গেশ্বরীকে বাঁচাতে গিয়ে সে বন্দী হলো। রাণী দুর্গেশ্বরী তাকে চেনে না কিন্তু আশা তাকে জানে। অবশ্য প্রথমে তাকে সে চিনতোনা। সেদিন হঠাৎ তার কুঠিরে প্রবেশ করে তারই আকাঙ্খিত জনের প্রতিচ্ছবি আশা দেখতে পেয়েছিলো। অবাক হয়ে গিয়েছিলো সে কারণ এখানে এ ছবি এলো কি করে। অসীম ধৈর্য নিয়ে প্রতিক্ষা করছিলো ঐ ছবির রহস্য জানার জন্য, জানতেও পেরেছিলো আশা ছবির মূল কারণটা। ছবির আড়ালে আত্নগোপন করে দেখেছিলো সে সব কিছু। বিস্মিত হয়েছিলো সে প্রথমে তারপর সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছিলো

কে এই পূজারিণী। আশা যখন জানালো—এক কালের দস্যুনেত্রী এখন সন্ন্যাসিনী তাপসী বনে গেছে। ভালবেসেছিলো সে দস্যু বনহুরকে। সে জানতে পারলো তাকে সে কোনদিন পাবে না তখন রাণীদুর্গেশ্বরী সন্ন্যাসিনী হলো এবং তার ধ্যান কামনার সামগ্রি হলো ঐ ছবিখানা। এটাও আশা জানতে পেরেছিলো রাণী দুর্গেশ্বরী নিজে ঐ ছবি এঁকেছিলো এবং সে ঐ ছবিকে ধরে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। প্রচুর ধন-সম্পদ ছিলো দূর্গেশ্বরীর, সব সে বিলিয়ে দিয়েছে দেশের দুঃস্থ জনগণের মধ্যে।

আশা নিজেও যে দস্যু বনহুরকে ভালবেসেছিলো। শুধু ভালবাসা নয় অন্তর দিয়ে তাকে কামনা করেছে কিন্তু সব আশা তার ব্যর্থ হয়েছে—বনহুর তাকে ধরা দেয়নি কোনদিন। কতদিন আশা নির্জনে বসে ওর জন্য কেঁদেছে কিন্তু সে কান্না তার সফল হয়নি। সে জানতো কোনদিন তাকে পাবে না—শুধু তার কথা তার ছবি মনের পর্দায় এঁকে নিয়ে সে ধ্যান করবে, তাই করেছে আশা। বন্ধ্যা জঙ্গলে বনহুরের সঙ্গে আমার শেষ দেখা তারপর কেটে গেছে কত দিন, কত মাস ও কত বছর। বন্দিনী অবস্থায় আমার মনে পড়ে ওর কথা, ও ছাড়া এ দুর্গম বন্দীশালা থেকে তাকে উদ্ধার করে এমন জন কেউ নেই। বৃদ্ধ চীনাটির কাছ থেকে আশা জেনে নেয় দ্বীপটির নাম, জেনে নেয় এরা কারা, কি এদের উদ্দেশ্য আরও জানতে পারে সে কেনো তাকে এরা বন্দী করে এনেছে। বৃদ্ধের কথায় বুঝতে পারে জলদস্যু হুয়াং তাকে দস্যুরাণী ভ্রমে বন্দী করে নিয়ে এসেছে।

চীনা বৃদ্ধের কথায় আশা জানতে পারে তার এক পুত্র হিন্দলে আছে। শুধু শহর নয় তাদের লোকজন হিন্দল জঙ্গলেও বাস করে। কথাটা শুনে অবাক হয়েছিলো আশা, মানুষ আবার জঙ্গলে বাস করে নাকি?

আশার কথায় চীনা বৃদ্ধ বলছিলো, আমার ছেলে যে দলে কাজ করে তারাও যে ডাকাত, কাজেই জঙ্গল ছাড়া তারা কি লোকালয়ে বাস করতে পারবে।

আশা বলেছিলো, তোমার ছেলে কি এখানে কোন সময় আসে?

বলেছিলো বৃদ্ধ—হাঁ, মাঝে মাঝে আসে। এবার এলে ঠিক নিয়ে আসবো তোমার কাছে। আমার ছেলেও ভাল ইংরেজি বলতে পারে।

আশার মনে একটা ক্ষীণ আশা উঁকি দেয়। সে বলে—ঠিক মনে থাকবে তো?

হাঁ থাকবে। বলেছিলো চীনা বৃদ্ধ।

হুয়াং ধূর্ত হলেও তার অনুচরদের সবাই তেমন ধূর্ত ছিলো না। বৃদ্ধ অনুচরটি ছিলো বড় সরল-সোজা লোক। আশার খাবার এনে বসে বসে অনেক কথা বলতো দু'জন মিলে।

নির্জন বন্দী শালায় চীনা বৃদ্ধটিকে পেয়ে আশা খুশি হতো অনেক। সময় কাটতো নানা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। অনেক গোপন কথা জেনেও নিতো আশা ওর কাছে।

একদিন সত্যিই বৃদ্ধ তার ছেলেকে নিয়ে হাজির হলো।

আশা আশ্চর্য হলো ভীষণ ভাবে কারণ বন্দী শালায় কি করে বৃদ্ধ ওকে নিয়ে এলো। সুড়ঙ্গ মুখের প্রতিটি বাঁকে একটি করে অস্ত্রধারী প্রহরী দিনরাত প্রহরায় নিযুক্ত আছে।

আশা বৃদ্ধের পুত্রকে অভিবাদন জানালো চীনা কায়দায় তারপর বললো—তোমার বাবার মুখে তোমার অনেক গুণগান শুনেছি। তুমি হিন্দল শহরে থাকো।

আশাকে দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলো বৃদ্ধের পুত্র কারণ তাকে কেউ কোন দিন অভিবাদন জানায়নি, আশা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে, এটা তার পক্ষে চরম আনন্দ। তাছাড়া আশার সৌন্দর্যও তাকে মুগ্ধ করেছে। আশার প্রশ্নে খুশি হয়ে জবাব দিলো সে—হাঁ আমি হিন্দল শহরে থাকি তবে হিন্দল জঙ্গলেও আমাদের ঘাটি আছে।

আশা বিস্ময় ভরা গলায় বললো—হিন্দল জঙ্গলে তোমাদের ঘাটি আছে?

বললো বৃদ্ধ পুত্র—হাঁ।

না বোঝার ভান করে বললো আশা—ঘাটি! কিসের ঘাটি?

আমি সেখানে কাজ করি।

কাজ করো! বেশ ভাল কথা, বসো ভাই তোমাকে আমার বড় ভাল লাগছে। একটু থেমে বললো আশা—ঠিক আমার ছোট ভাইএর মত তুমি দেখতে। আচ্ছা ভাই তোমার নাম কি?

নাম, লিয়ং-লিচু।

হাঁ, সুন্দর নাম তো।

চীনা বৃদ্ধ খুশি হয়ে বলে ও নামটা লিয়ং-লিচুর মা রেখেছিলো। লিয়ং আমাদের বড় আদরের ধন।

আশা বললো—আমিও ওকে আদর করবো কারণ আমার ভাই লিয়ং-লিচু।

বন্দী শালায় বৃদ্ধ ও তার পুত্রটিকে আশা কথায় ভুলিয়ে ফেললো। অল্পক্ষণেই আপন করেছিলো সে বৃদ্ধের পুত্রটিকে। জেনে নিলো আরও অনেক কথা।

বৃদ্ধের পুত্র বনহুরের হিন্দল ঘাটির একজন অনুচর এ কথাও আশা জানতে পারলো তার কথায়। আনন্দে ভরে উঠলো তার মন, একটি চিঠি লিখে বললো আশা—লিয়ং তুমি এই চিঠখানা তোমাদের ঘাটির কারো হাতে পৌছে দিতে পারো কি?

লিয়ং খুশি ভরা গলায় বললো নিশ্চয়ই পারি। আশার ব্যবহার আর মিষ্টি কথায় লিয়ং-এর মন জয় করে নিয়েছিলো তাই এতো সহজ হলো সে ওর কাছে।

বৃদ্ধ পুত্রকে প্রহরীর ছদ্মবেশেই এই গোপন সুড়ঙ্গ মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলো। অবশ্য বৃদ্ধ নিজেও আশাকে ভালবেসে ফেলেছিলো নিজ কন্য সম। আশাকে দেখলে চীনা বৃদ্ধটির মনে জাগতো তার বিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া কন্যা কুইনের কথা।

কুইন ছিলো লিয়ং-লিচু এর বড় বোন। বয়স যখন ওর পাঁচ বছর তখন সে মারা যায়। কুইন মারা যাবার এক বছর পর জন্মগ্রহণ করেছিলো লিয়ং-লিচু। তাই সে বড় বোনকে দেখে নাই কিন্তু বাবার মুখে বড় বোনের অনেক গল্প সে শুনেছিলো। গল্প শুনে শুনেই সে মনের পর্দায় বোনের ছবি এঁকেছিলো। ভাবতো লিয়ং-লিচু, যদি তার বোন বেঁচে থাকতো তাহলে আজ তাকে সে কত আদর করতো। বড় বোনের কথা মনে হলে আজও লিয়ংএর মন ব্যথায় টন টন করে উঠে।

লিয়ংএর বাবারও সেই অবস্থা, শিশু কন্যাকে হারিয়েছে বিশ বছর আগে তবু সে কন্যার মুখখানা আজও মনে রেখেছে, নির্জনে বসে বসে ভাবে বৃদ্ধ অনেক সময় কুইনের কথা। আশাকে যখন বৃদ্ধ প্রথম খাবার দিতে

এসেছিলো যখন ওকে দেখেই নিজ কন্যার কথা মনে পড়েছিলো, আজ যদি কুইন বেঁচে থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই সে এই মেয়েটির মতো-নিজ কন্যার কথা ভেবেই ভালোবেসে ছিলো ওকে।

আশা সুচতুরা, সে চীনা বৃদ্ধের মনোভাব জেনে নিয়েছিলো তার আচরণে। তাই সেও তাকে আপন করে নিতে চেষ্টা করেছিলো এবং সে ভালভাবেই জানতো এখান থেকে উদ্ধার পেতে হলে এদের একজনকে হাত করতেই হবে। আশার সে বাসনা পূর্ণ হয়েছিলো।

আশা যখন জানতে পারলো চীনা বৃদ্ধের পুত্র লিয়ং হিন্দলে কোন এক দলে কাজ করে তখন মনে তার বিরাট এক আশার আলো উঁকি দিয়েছিলো, হঠাৎ মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিলো একটি মুখ যে মুখ তার মনের গহনে আঁকা হয়ে আছে কঠিন পাথরে খোদাই মূর্তির মত। ভেবেছিলো আশা—যদি লিয়ং বনহুরের কোন অনুচর হতো তাহলে......আনন্দে আশার মন দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো......তাহলে তার সেই আকাঙ্খিত জনকে সে জানাতে পারতো তার বিপদের কথা। আশা ভাবে আরও অনেক কথা, একবার সমুদ্র বক্ষ থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলো সে। মৃত্যুর কবল থেকেই বলা যায়, সেদিন ওকে কাছে পেয়ে আশা নতুন জীবন লাভ করেছিলো। দুর্গম বন্দীশালায় তাকে স্মরণ করে, হেসে বলেছিলো আশা লিয়ং তুমি যে দলে কাজ করো তার দলপতি বা নেতার নাম কি বলতে পারো।

পারি। বলেছিলো লিয়ং।

তবে বলো?

লিয়ং কোন দ্বিধা না করে বলেছিলো আমি যে দলে কাজ করি সে দলের দলপতি বা নেতা হায়দার আলী কিন্তু আমাদের আরও একজন নেতা বা সর্দার আছে...অবশ্য আমি তাকে দেখি নাই কোনদিন—তার নাম দস্যু বনহুর.......

এ্যা কি বললে? অস্ফুট আওয়াজ করেছিলো আশা, দু'চোখ তার দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো মুহূর্তে।

লিয়ং লিচু যদি চালাক হতো তখন ঠিক সন্দেহ করে বসতো আশার কথা বলার ভঙ্গী দেখে। কিন্তু সে বেশ বোকা ধরণের ছিলো তাই আশার আচরণ তাকে কিছুমাত্র বিস্মিত করলো না।

আশা বললো—কেনো সর্দার বুঝি তোমাদের মধ্যে আসেনি কোনদিন?

সর্দার যখন আসে তখন তার বিশিষ্ট অনুচর ছাড়া কেউ তার সম্মুখে যেতে পারে না, নির্দেশও নেই তেমন কিছু।

ও এবার বুঝেছি সব কথা।

চীনা বৃদ্ধ বলে উঠে—আমাদের দলপতি কিন্তু তেমন নয়, আমাদের সবার সম্মুখে সে আসে এবং কথা বলে।

আশা বৃদ্ধকে খুশি করার জন্য বলে—তোমাদের সর্দার খুব ভাল মানুষ।

আশার কথায় বৃদ্ধ মৃদু হেসে বলে—ঠিক বলেছো মা, ঠিক বলেছো।

আশা চিঠিখানা বের করে হাতে দেয় লিয়ং-এর, বলে সে—লিয়ং লক্ষী ভাইটি আমার এই চিঠিখানা তোমাদের দলের কোন লোকের হাতে দেবে।

লিয়ং ইংরেজিতে কিছু কথা বলতে পারলেও সে ইংরেজি শব্দ পড়তে পারতো না তাই চিঠিখানাতে কি লিখা আছে বুঝতে পারলো না।

আশা চিঠিখানা ওর হাতে দিয়ে বলেছিলো—খবরদার এ চিঠিখানা যেন কাউকে দেখিও না। দেখলে তোমার বিপদ হবে, আমারও বিপদ আসবে।

অতো বোঝেনি লিয়ং চিঠিখানা তাই সে গোপনে লুকিয়ে নিলো পকেটের মধ্যে তারপর পিতার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিলো যেমন ভাবে এসেছিলো তেমনিভাবে।

❑

আশা চিঠিখানা পাঠিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, কারণ চিঠিখানা ঠিকমত পৌঁছবে কিনা জানে না সে। জানে না লিয়ং চিঠিখানা তার দলের হাতে দেবে কিনা, তা ছাড়া আরও একটি সন্দেহ আশার মনে উঁকি দিচ্ছিলো সে হলো লিয়ং সত্যি কথা বলেছে না মিথ্যা বলেছে তাই বা কে জানে? নানা রকম চিন্তায় আশার মন দোদুল দোলায় দুলছিলো।

আশা যখন আপন মনে বনহুরের কথা ভাবছে তখন বনহুর নীল সাগর অতিক্রম করে হিন্দল এসে পৌঁছলো। আস্তানায় এসে পৌঁছতেই অনুচরগণ তাকে অভ্যর্থনা জানালো।

বনহুর সবাইকে ডেকে বললো—কে আমাকে এ চিঠি পাঠিয়েছে তাকে আমার সম্মুখে হাজির করো। চিঠিখানা বের করে দেখালো সে অনুচরদের।

একজন অনুচর বললো—সর্দার, আমি এ চিঠি দিয়েছিলাম।

তুমি কোথায় পেলে?

আমাকে দিয়েছিলো আমাদেরই একজন অনুচর।

কি নাম তার?

লিয়ং-লিচু।

সেই চীনা ছোকড়া?

হাঁ সর্দার।

বনহুরের মুখমণ্ডল দীপ্ত হয়ে উঠলো, আশার উদ্ধার ব্যাপারে একটা ক্ষীণ আশার আলো উঁকি দিলো তার মনে।

বনহুরের অনুচরটি বললো—সর্দার, লিয়ং চিঠিখানা দিয়েছিলো আমাকে, আমি সেটা দিয়েছিলাম কায়েসকে......

হাঁ, কায়েসই দিয়েছে আমাকে। বললো বনহুর।

হায়দার আলী দাঁড়িয়েছিলো পাশে। সে নত মস্তকে অপেক্ষা করছিলো সর্দারের নির্দেশের। না জানি কি হুকুম হয় কখন।

বনহুর বললো—হায়দার আলী লোকমানকে নিয়ে হিন্দল শহরে যাও। আমার ২নং ঘাটি থেকে লিয়ং-লিচুকে নিয়ে এসো। আমি তার কাছে সঠিক সংবাদ জানতে চাই।

হিন্দল ঘাটির অধিনায়ক হায়দার আলী সর্দারের কথায় বললো—আচ্ছা সর্দার, আমি আপনার আদেশ মত কাজ করবো।

হায়দার আলী বেরিয়ে গেলো তখন।

সর্দারের আগমনে হিন্দল ঘাটিতে একটা আনন্দ উৎসবের আয়োজন করলো অনুচররা। বনহুর অবশ্য অমত করেছিলো এ ব্যাপারে, কারণ সে ইচ্ছা করে এ সময় বেড়াতে আসেনি। নিতান্ত প্রয়োজনেই বনহুর এবার হিন্দল এসেছে।

তবু অনুচররা সবাই আনন্দে মেতে উঠলো। তারা নানারকমের বাজী—তামাসার আয়োজন করলো। বনহুরের হিন্দল ঘাটিতে কোন নারী ছিলো না তাই পুরুষরাই নারী সেজে নাচগান করলো।

অনুচররা তাকে নিয়ে যতই আনন্দে মেতে উঠুক, বনহুরের মনে তখন নানা চিন্তার উদ্ভব হচ্ছিলো। আশার কথাই ভাসছিলো তার কানের কাছে। আশা বন্দিনী অবস্থায় কেমন আছে কে জানে?

একটি দিন এবং একটি রাত তার কেটে গেলো।

হিন্দল ঘাটির বিশ্রামাগারে বনহুর বিশ্রাম করছে আর ভাবছে, আশার উদ্ধারের কথা। শুধু আশার কথাই নয় আরও অনেক কথা মনে পড়েছে তার। যেমন করেই হউক আশাকে চীন দস্যু নাংচু-হুয়াং এর হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে। অনেক ভরসা নিয়েই সে চিঠিখানা দিয়েছিলো। জানে চিঠি পেয়ে বনহুর নিরব থাকতে পারবে না। বনহুর একটির পর একটি সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে। মাঝে মাঝে পায়চারী করছে সে, ললাটে ফুটে উঠেছে গভীর চিন্তা রেখা।

একদিন এক রাত্রি কেটে গেছে এখনও ফিরে আসেনি হায়দার আলী লিয়ং-লিচুকে নিয়ে। বনহুর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না, কারণ তার কত কাজ পড়ে আছে। মনে পড়ছে হাজরা গ্রামের কথা, মাতব্বর ইকরাম আলীর ব্যবসা এই দীর্ঘ সময়ে আরও ফেঁপে উঠেছে। সে গ্রামের দুঃস্থ জনগণের মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তাকে সহায়তা করে চলেছে গ্রামের কয়েকজন দুষ্ট লোক। হবি মোল্লা হলো তার দক্ষিণ হাত। সে তার ঘোড়া নিয়ে শহরে যায়, দেশের যারা হর্তা-কর্তা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করে। শয়তান কর্তাদের সহায়তা পেয়েই তো ওরা এমন দুঃস্কর্ম করতে পারছে......

বনহুরের চিন্তায় বাধা পড়ে। হায়দার আলীর গলার স্বর শোনা যায়— সর্দার ভিতরে আসতে পারি?

বনহুর পায়চারী করতে করতে ভাবছিলো কথাগুলো, এবার সে আসন গ্রহণ করে বলে—এসো, ভিতরে এসো।

হায়দার আলী বনহুরের বিশ্রামাগারে প্রবেশ করে কুর্নিশ জানায়।

হায়দার আলীর সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখ।

সেও হায়দার আলীর অনুকরণে কুর্নিশ জানালো বনহুরকে।

হায়দার আলী বললো—সর্দার এর নাম লিয়ং-লিচু।

লিয়ং-লিচুর দু'চোখে বিস্ময় ফুঠে উঠেছে, সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে সর্দারকে। বহুদিন সে সর্দারের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে এসেছে কিন্তু তাকে কোনদিন চোখে দেখেনি। আজ সর্দারকে দেখবার সৌভাগ্য অর্জন করে সে নিজকে ধন্য মনে করলো।

বনহুর আশার চিঠিখানা বের করে মেলে ধররো লিয়ং-এর সম্মুখে—এ চিঠি তুমি এনেছিলে?

বললো লিয়ং—হাঁ, আমি এ চিঠি এনেছিলাম।

তুমি কোথায় পেয়েছিলে?

চীনা দস্যু হুয়াংএর বন্দী শালায় এক বন্দিনীর কাছ থেকে।

বন্দিনী তোমার পরিচিত?

হাঁ, আমার নয় বাবার পরিচিত সে?

কে তোমার বাবা আর তার নামই বা কি?

আমার বাবা একজন......থামলো লিয়ং-লিচু।

বনহুর ওর মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো—বলো থামলে কেনো?

লিয়ং-লিচু বললো—বাবা চীনা দস্যু হুয়াংএর একজন বিশ্বস্ত অনুচর। বাবার কাজ বন্দীশালায় খাবার দেওয়া। নাম লাং-চুমিং।

বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখছিলো—সে কোন মিথ্যা কথা বলছে কিনা। হায়দার আলী পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো, সে বুঝতে পারলো সর্দার লিয়ংকে ঠিক মত বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই হায়দার আলী বললো—সর্দার লিয়ং যা বলছে সম্পূর্ণ সত্য কারণ সে জানে এর একটি মিথ্যা হলে তার জীবন রক্ষা পাবে না।

বনহুর বললো—আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?

লিয়ং কোন কথা না বলে মাথা নিচু করলো।

বনহুর বুঝতে পারলো, সে এমন ঝুঁকি গ্রহণ করতে রাজি নয়। বললো বনহুর—বেশ আমি একাই যাবো তুমি শুধু আমাকে পথের নির্দেশ বলে দাও।

লিয়ং কোন জবাব দিলো না।

বনহুর হায়দার আলীকে লক্ষ্য করে বললো—কাগজ আর কলম নিয়ে এসো।

হায়দার আলী সর্দারের আদেশ মত কাজ করলো, সে কাগজ আর কলম এনে রাখলো সর্দারের সম্মুখে।

বনহুর বললো—বলো, এবার পথের নির্দেশ দাও।

লিয়ং-লিচু বলতে শুরু করলো আর বনহুর রেখা এঁকে চললো। শুধু মাত্র কয়েকটি আঁচড় মাত্র। বনহুর কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে রেখে বললো—হায়দার আলী লিয়ংকে তার জায়গায় পৌঁছে দাও। যাও এখন তোমরা।

হায়দার আলী আর লিয়ং-লিচু কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে নিয়ে একটি নতুন সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো। রাশি রাশি ধূম্র-কুন্ডলির মধ্যে তলিয়ে গেলো বনহুর। যে পথের নির্দেশ সে পেয়েছে তা অতি ভয়ঙ্কর পথ, এই পথ অতিক্রম করতে পারলে তবেই সে পৌঁছবে আশার কাছে।

❑

হায়দার!

বলুন সর্দার?

বনহুর অশ্বের গতিরোধ করে ডাকলো, তার সহচর হায়দার আলীকে।

হায়দার আলীও তার অশ্বের লাগাম টেনে ধরে অশ্ব থামিয়ে ফেলেছিলো।

যেখানে বনহুর আর হায়দার আলী অশ্ব নিয়ে এসে দাঁড়ালো সে জায়গা একটি সুউচ্চ পর্বতের পাদমূল। বনহুর আর হায়দার আলী তাকালো পর্বতের উপরিভাগের দিকে। আকাশ চুম্বি পর্বতের শৃঙ্গটির দিকে তাকিয়ে বললো

বনহুর—হায়দার, এই পর্বতের শৃঙ্গের মাথায় কোন এক স্থানে রয়েছে সেই সুড়ঙ্গ পথের দ্বিতীয় মুখ। যে ঠান্ডা পড়েছে তাতে আজ আর এগুনো সম্ভব হবে না।

হাঁ সর্দার, বড় ঠান্ডা।

বেলা ডুবে আসছে তাই ঠান্ডা বেশি অনুভব হচ্ছে। আজ রাতে আমরা পর্বতের কোন এক গুহায় কাটিয়ে নেবো।

সর্দার, পুটলি খুলে আপনার শীত বস্ত্র বের করে দেবো কি?

হাঁ, শীতবস্ত্র পরে নিতে হবে কিন্তু তার পূর্বে চলো অন্ধকার হবার আগে কোন এক গুহা খুঁজে নেই, চলো। অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর।

হায়দার আলীও সর্দারের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠ ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো।

বনহুর নিজ অশ্বকে বেঁধে রাখলো একটা আগাছার সঙ্গে। হায়দার আলীও তার অশ্বকে বেঁধে রেখে অগ্রসর হলো।

এখনও পৃথিবীর বুক থেকে সূর্যাস্তের আভা মিশে যায়নি। যদিও পর্বতের পাদমূলে কিছু কিছু অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠার উপক্রম হচ্ছে সবেমাত্র। আগাছা আর শালগাছের ডালে ডালে পাখির কলরব মুখর করে তুলেছে।

বনহুর আর হায়দার আলী এগুলো সম্মুখে। ছোট বড় টিলার পাশ কেটে কেটে এগুতে লাগলো ওরা। রাতের মত একটি গুহা তাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

বনহুর বললো—হায়দার, তেমন কোন গুহা যদি না পাওয়া যায় তাহলে বড় অসুবিধা হবে, কারণ এসব জায়গা বড় মন্দ......কথা শেষ হয় না বনহুরের একটা হুঙ্কার তাদের কানে তাল লাগিয়ে দেয়।

চমকে ফিরে তাকায় বনহুর আর হায়দার আলী তারা দেখতে পায় একটি বিরাট আকার গণ্ডার গর্জন করে এদিকে এগিয়ে আসছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে একটা গাছের আড়ালে হায়দার আলীকে ঠেলে দিয়ে বলে উঠে—শীগ্‌গীর এ গাছে উঠে যাও হায়দার।

সর্দার আপনি......

আমি দেখি অশ্ব দুটিকে রক্ষা করতে পারি কি না......

সর্দার। অস্ফুট উচ্চারণ করে উঠে হায়দার আলী।

কিন্তু ততক্ষণে বনহুর চলে গেছে অশ্ব দু'টির কাছাকাছি। দ্রুত হস্তে খুলে দেয় সে অশ্ব দু'টির লাগামের বাঁধন।

ততক্ষণে গণ্ডারটিও অতি নিকটে এসে পড়েছে। মাথার সূতীক্ষ্ণ খর্গখানা নিচ করে তীর বেগে ছুটে এসে হায়দার আলীর অশ্বের পেটে বিদ্ধ করে চিরে ফেলে পেটটা।

বনহুর ক্ষিপ্ততার সঙ্গে একটি টিলার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

আহত অশ্বটি একবার আর্তনাদ করে উঠে নীরব হয়ে গেলো।

দ্বিতীয় অশ্বটি ততক্ষণে ছুটে চলে গেছে একটি ঝোপের মধ্যে। জানোয়ার হলেও তার বুদ্ধি আছে, আছে প্রাণের ভয়।

গণ্ডারটি ক্রুদ্ধভাবে দুই বার নিহত অশ্বের উপরে খর্গের আঘাত করে দৌড় দিলো সম্মুখে। হয়তো বা সে বনহুরকে লক্ষ্য করেছিলো।

বনহুর টিলার আড়ালে থেকে দেখলো, গণ্ডারটা ছুটে চলে গেলো তার টিলার পাশ দিয়ে উত্তর দিকে, যেখানে গাছের আড়ালে আত্মগোপন করেছিলো হায়দার আলী। বনহুরের মনটা চড়াৎ করে উঠলো, হায়দার আলী কি তবে গাছে উঠতে পারেনি।

বনহুর টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডালে শোনা গেলো হায়দার আলীর কণ্ঠস্বর—সর্দার, বের হবেন না। লুকিয়ে পড়ুন......লুকিয়ে পড়ুন......

বনহুর তাকিয়ে দেখলো গাছের ডালে পাতার আড়ালে বসে আছে হায়দার আলী। আশ্বস্ত হলো বনহুর। সে পুনরায় টিলার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

ওদিকে ক্রুদ্ধ গণ্ডারটি তীর বেগে দক্ষিণ দিকে লক্ষ্য করে ছুটে চলে গেলো।

গণ্ডারটি মনে করেছে ঐ দিকেই বুঝি গেছে দ্বিতীয় অশ্ব এবং লোকটা তাই সে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে চলে গেলো গণ্ডারটি।

বনহুর আবার বেরিয়ে এলো টিলার আড়াল থেকে। গণ্ডারটিকে লক্ষ্য করে তাকালো হায়দার আলীর দিকে। ততক্ষণে সন্ধার অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে, তাই গাছের ডালে লক্ষ্য করে কিছুই নজরে পড়লো না। উচ্চকণ্ঠে ডাকলো বনহুর—হায়দার হায়দার,......

এই যে সর্দার। হায়দার আলী ঠিক বনহুরের কাছা-কাছি এসে পৌঁছেছে।

বনহুর বললো—হায়দার উপস্থিত বিপদ কাটলো কিন্তু আরও কোনো ভয়ঙ্কর বিপদ আমাদের জন্য ওৎ পেতে আছে কিনা কে জানে। বড় আফসোস অশ্বটিকে গণ্ডার নির্মমভাবে হত্যা করে ফেললো।

হাঁ সর্দার, বড় দুঃখের কথা, বেচারী অশ্বটির নির্মম মৃত্যু হবে ভাবতে পারিনি।

চলো—আর এখানে বিলম্ব করা ঠিক হবে না। পা বাড়ালো বনহুর।

হায়দার আলী তাকে অনুসরণ করলো।

ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে সম্মুখে কিছুটা এগুতেই তারা দেখতে পেলো একটি ছোট্ট আকার গুহা। যদিও ভিতরটা জমাট অন্ধকারে ভরা তবু তারা খুশি হলো মনে মনে।

বনহুর পকেট থেকে খুদে টর্চটা বের করে আলো ফেললো গুহাটির অভ্যন্তরে। এবার আরও খুশি হলো বনহুর আর হায়দার আলী কারণ গুহাটি বড় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন লাগছে।

হায়দার বললো—সর্দার গুহাটা বড় পরিস্কার।

হাঁ, আশ্চর্য বটে। চলো হায়দার ভিতরে যাওয়া যাক।

সর্দার গুহায় প্রবেশ করবার পূর্বে আমাদের শীত বস্ত্রগুলো পরে নেই।

হাঁ, তাই করো। বললো বনহুর।

হায়দার আলী পিঠ থেকে পুটলিটা খুলে নিয়ে শীত বস্ত্র বের করে সর্দারের হাতে দিলো। ডিসেম্বরের শেষ ভাগ কাজেই প্রচন্ড শীত পড়ছে। বেশ কুয়াশা পড়ছে।

বনহুর গরম কাপড় পরে নিতে নিতে বললো—তুমিও পরো।

হায়দার আলী বললো—হাঁ আমিও পরে নিচ্ছি।

শীত বস্ত্র পরে নিয়ে গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো বনহুর আর হায়দার আলী। গুহার মধ্যে প্রবেশ করে টর্চ জ্বালাতেই অবাক হলো বনহুর ও হায়দার আলী। গুহার মধ্যে এক পাশে কতকগুলো পাতা সুন্দর করে বিছানা আকারে বিছানো রয়েছে। বনহুর বললো—হায়দার আমার মনে হয় এ গুহায় কেউ বাস করে।

হাঁ সর্দার, আমারও তেমনি মনে হচ্ছে। ঐ দেখুন কতকগুলো পাতা সুন্দরভাবে বিছানো রয়েছে—তা ছাড়াও কতকগুলো পাতা বালিশ আকারে তৈরি করে এক পাশে রাখা হয়েছে।

নিশ্চয়ই কোন মানুষ এ গুহায় বাস করে। জীব-জন্তু হলে এমন পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে পাতাগুলো বিছানো থাকতো না। কথাগুলো বললো বনহুর।

হায়দার আলীর চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। সে বললো—সর্দার ঠিক্ বলেছেন, যেমনভাবে পাতাগুলো বিছানো এবং লতা দিয়ে জড়িয়ে পাতাগুলো দিয়ে বালিশ তৈরি করা হয়েছে তাতে মনে হয় মানুষ ছাড়া কোন জীব-জন্তু নয়।

হাঁ, তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু যে এখানে বাস করে সে এখন কোথায় কে জানে? কেমন তার স্বভাব হিংস্র না ভদ্র তাও বোঝা যাচ্ছে না। চলো ঐ পাতার বিছানায় আপাতত আশ্রয় নেওয়া যাক।

সর্দার একটি অশ্ব গণ্ডারের খর্গের আঘাতে নিহত হলো, অপরটি ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করলো। না জানি সে কোথায় কোন দিকে পালালো......

হায়দার অশ্বের চিন্তা পরে করা যাবে এখন নিজেদের চিন্তা করো। গুহায় যে বাস করে সে কেমন জানি না, যদি সে হিংস্র হয় তবে আমাদের আচরণে ক্রুদ্ধ হবে কারণ বিনা হুকুমে আমরা তার আবাসে প্রবেশ করেছি........

আর যদি মহৎ হয় তাহলে?

এমন মনুষ্য বসবাসহীন পর্বতের নির্জন পাদমূলে কোন্ মহাত্মার আশা করো হায়দার আলী?

সর্দার অনেক সময় অনেক মহাত্মা তপসা কারণে বন-জঙ্গলে পাহাড়-পর্বতের গুহায় নির্জন স্থানে যোগ সাধন করে থাকেন।

হাঁ, সে কথা মিথ্যা নয় হায়দার আলী কিন্তু এ গুহা দেখে কোন সাধকের গুহা বলে মনে হচ্ছে না, তবে তোমার ধারণা সত্যও হতে পারে। বনহুর কথাগুলো বলে বসে পড়লো পাতার বিছানার উপরে।

হায়দার আলীও বসলো, কারণ সর্দার বসেছে সে না বসে কোন উপায় নেই।

বনহুর পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটি সিগারেট নিয়ে তাতে আগুন ধরালো।

হায়দার আলী বললো—সর্দার পুটলিতে খাবার আছে বের করবো?

বনহুর বললো—করো। বেশ খিদে পেয়েছে।

হায়দার আলীরও খিদে পেয়েছিলো। সে পুটলি খুলে খাবার বের করবার আয়োজন করলো কিন্তু গুহার মধ্যে তখন জমাট অন্ধকার থাকায় অসুবিধা হচ্ছিলো। হায়দার আলী বললো—সর্দার আগুন জ্বালাবো?

হাঁ, তাই জ্বালো, না হলে দু'চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঐ ধারে অনেক শুকনো স্তূপ দেখলাম ঐ পাতা আর শুকনো কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালো।

হায়দার আলী সর্দারের নির্দেশ পেয়ে আগুন জ্বালার আয়োজন করলো।

বনহুর তখন আপন মনে সিগারেট পান করে চলেছে। মনে তার নানা রকম চিন্তা কিলবিল করছিলো। আশাকে চীনা দস্যুর কবল থেকে উদ্ধার করতেই হবে, তাকে যতক্ষণ না খুঁজে বের করা সম্ভব হবে ততক্ষণ স্বস্তি নাই তার।

হায়দার আলী শুকনো পাতায় আগুন ধরিয়ে দিতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গুহাটা বেশ গরম হয়ে উঠলো। আরাম বোধ করছে হায়দার আলী। বনহুর যদিও একটু দূরে বসেছিলো তবু তার দেহ বেশ উষ্ণ মনে হচ্ছে। বললো বনহুর—হায়দার, আগুন জ্বেলে ভাল কাজ করেছো। যেমন ঠান্ডা বোধ হচ্ছিলো এখন খুব আরাম লাগছে। তাছাড়া হিংস্র জীবজন্তু এ মুখো হবে না।

সর্দার আপনি ঠিক বলেছেন, আগুন দেখলে হিংস্র জীব-জন্তু নিকটে আসবে না।

এসো এবার বসো হায়দার।

হায়দার আলী আরও কিছু শুকনো কাঠ আর পাতা আগুনে দিয়ে সর্দারের পাশে এসে বসলো।

আগুনের লালচে আভা এসে পড়েছে তার সর্দারের মুখে। হায়দার আলীর দৃষ্টি সর্দারে মুখে পড়তেই সহসা চোখ দুটি ফিরিয়ে নিতে পারলো না। আগুনের লাল আভায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে সর্দারকে। মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে হায়দার আলী। ভাবে সে সত্যি তাদের সর্দার সুন্দর সুপুরুষ বটে।

হায়দার আলীকে তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে বনহুর—কি দেখছো অমন করে?

লজ্জা পায় হায়দার আলী বলে সে—সর্দার কিছু না। মাথাটা সে নিচু করে নেয় আলগোছে।

বনহুর সিগারেট থেকে আর এক মুখ ধোয়া ত্যাগ করে বলে—নিশ্চয়ই তুমি কিছু গোপন করছো। বলো হায়দার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তুমি কি ভাবছিলে?

সর্দার ভাবছিলাম না, দেখছিলাম......

কি দেখছিলে হায়দার?

আপনার মুখ।

হেসে সোজা হয়ে বসে বনহুর, আমার মুখ তার মানে?

ও কিছু না সর্দার।

না, তোমাকে বলতেই হবে হায়দার, তুমি কি দেখছিলো বা ভাবছিলে আমার মুখে দৃষ্টি রেখে।

সর্দার, দেখছিলাম আপনার সুন্দর বলিষ্ঠ মুখ......

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো বনহুর তারপর বললো—এ কথা তোমার মুখে শোভা পায় না হায়দার। একটু থেমে বললো আবার সে—বয়স আমার কম হয় নি, তবু অনেকে আমাকে যুবক বলে। সত্যিই আমার তখন হাসি পায়......পুনরায় বনহুর একটি নতুন সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো। নতুন সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করবার পূর্বে অর্ধ দগ্ধ সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ করেছিলো বনহুর।

গুহার অন্ধকারের কোণে সিগারেটটির আগুন জোনাকীর আলোর মত মনে হচ্ছিলো। বনহুর নতুন সিগারেটে বার দুই টান দিয়ে বললো—তোমরা সবাই আমাকে ভালবাসো তাই আমি তোমাদের সবার চোখে সুন্দর, বুঝলে হায়দার? যাক এবার কাজের কথা শোন।

বলুন সর্দার।

জম্বু, হিন্দল, আর ঝাম এ তিনটি ঘাটির দলপতি তুমি। যদিও রামসিং জম্বুর সর্দার তবু তোমাকে আমি জম্বু ঘাটির তত্ত্বাবধান করার অনুমতি দিয়েছি।

হাঁ সর্দার, দিয়েছেন।

দেখো, জম্বুতে তুমি ফিরে যাও। জম্বুর রত্নাগারে কয়েকজন স্বনাম ধন্য ব্যক্তিকে রত্নভক্ষণ আশায় আটক করে রেখেছি, এবার তাদের কান্দাই ঘাটিতে নিয়ে আসবে, বিচার হবে।

সর্দার আপনি......

হাঁ, আমি এবার একাই যাবো চীন দস্যু নাংচু-হুয়াং-এর সেই ভূগর্ভ দূর্গ মধ্যে। আশাকে উদ্ধার করে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিয়ে সোজা ফিরে আসবো কান্দাই। তারপর যাবো হাজরা গ্রামে। হাজরা গ্রামে আমার কিছু কাজ এখনও বাকি আছে।

হায়দার আলী অগ্নি কুন্ডটার মধ্যে কিছু শুকনো পাতা তুলে দিয়ে বললো—সর্দার, হাজরা গ্রামে আপনি বেশ কিছুদিন ছিলেন।

হাঁ ছিলাম, তবু কাজ শেষ হয়নি, কারণ আমাকে ধৈর্য সহকারে কাজ করতে হয়েছে। হায়দার শুধু হাজরা নয়, সমস্ত দেশ জুড়ে আজ বিরাজ করছে একটা অন্যায়-অনাচার আর অবিচার......শেষ কথাগুলো দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর। একটু থেমে পুনরায় বললো—যতদিন দেশের এই অন্যায় অনাচার আর অবিচার নিঃশেষ না হবে ততদিন আমার কাজ শেষ হবে না।

হায়দার আলী বললো—সর্দার, দেশ থেকে এ সব কি একেবারে নিঃশেষ করা সম্ভব?

সম্ভব করতে হবে হায়দার। যে দেশ অন্যায় অনাচার আর অবিচারের রাজ্য সে দেশ কোনদিন টিকে থাকতে পারে না—সে দেশ ধ্বংস হয়ে যায়, নিচিহ্ন হয়ে যায় পৃথিবীর বুক থেকে, বুঝলে? আমি চাই আমার দেশ পৃথিবীর বুকে টিকে থাক, বেঁচে থাক আর সেই কারণেই আমার এ সংগ্রাম......বনহুরের কণ্ঠস্বর কেমন যেন গম্ভীর মনে হয়।

হায়দার ও বনহুর উভয়ে নীরব।

অগ্নিকুন্ডটা জ্বলছে।

একরাশ ধূম্র কুন্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গুহার মুখ দিয়ে বাইরের দিকে। জমাট অন্ধকারে ধূম্র-কুণ্ডলি গুলোকে এক একটা মেঘের চাপ বলে মনে হচ্ছিলো। বনহুর সেই দিকে তাকিয়ে ছিলো এক দৃষ্টে আর ভাবছিলো ঐসব শয়তানদের কথা। যারা দেশটাকে সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

নিস্তব্ধ গুহা।

কোন সাড়া শব্দ নেই।

হায়দার আলী বললো—সর্দার আপনি এবং আপনার অনুগত বান্দা—আমরা সংগ্রাম চালিয়ে কতটুকু কৃতকার্য হবো জানি না।

আমার চেষ্টা সার্থক হবেই হায়দার কারণ অন্যায় কোনদিন টিকে থাকতে পারে না। যারা দেশ ও দেশের জনগণের শত্রু তারা কোনদিনই সর্বশক্তিমানের বিচারে রেহাই পাবে না, নিশ্চিহ্ন তারা হবেই।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা নারী কণ্ঠের হাসির শব্দ ভেসে এলো গুহার বাইরে থেকে। হাসির শব্দটা যেন জমাট অন্ধকার চিরে খান খান করে ভেসে এলো।

এক সঙ্গে চমকে উঠলো বনহুর আর হায়দার আলী। উভয়ে তাকালো উভয়ের মুখের দিকে। অগ্নিকুন্ডটার আলোতে অন্ধকার গুহার সব জায়গা আলোকিত না হলেও বনহুরের মুখমণ্ডল হায়দার আলী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো। বনহুরও দেখতে পাচ্ছে হায়দারের মুখখানা। সে বুঝতে পারলো সর্দার নিজেও খুব বিস্মিত হয়েছে। এই জন-মানবহীন নির্জন জায়গায় নারী-কণ্ঠের হাস্যধ্বনি আশ্চর্য বটে।

বললো হায়দার—সর্দার.......

হাঁ, আমিও শুনতে পেয়েছি, কেউ লুকিয়ে আছে আমাদের গুহার আশে পাশে। দাঁড়াও আমি গুহার বাহিরটা দেখে আসি একবার।

না সর্দার, এ সময় আপনার বাইরে যাওয়া উচিৎ হবে না।

হায়দার কোন কিছু ভেবো না আমার হাতে টর্চ আছে।

কিন্তু বাইরে যাওয়াটা......

বনহুর ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে গেছে।

হায়দার আলীও না গিয়ে পারলো না, সেও সর্দারের পিছনে পিছনে বেরিয়ে এলো গুহা থেকে।

চারিদিকে জমাট অন্ধকার।

নিজের হাতখানাও নজরে পড়ে না।

হায়দার আলীও কম দুঃসাহসী নয় তবু তার শরীরটা দুম-দুম করে উঠলো, জমাট অন্ধকারে চারদিকে কেমন যেন থম-থম করছে। সম্মুখে তাকালো সে কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না।

হঠাৎ পিছনে পদশব্দে ফিরে তাকালো—অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখা না গেলেও বুঝতে পারলো কেউ এ দিকে এগিয়ে আসছে। হায়দার আলী কিছু বলবার পূর্বেই বলে উঠে বনহুর—ভয় পেয়োনা হায়দার, আমি।

হায়দার আলী বললো—না সর্দার, ভয় পাইনি।

চলো, গুহার ভিতরে চলো।

চলুন।

বনহুর আর হায়দার আলী গুহার ভিতরে প্রবেশ করলো।

গুহায় প্রবেশ করে বললো বনহুর—কোথাও কাউকে দেখলাম না।

সর্দার এমন অন্ধকারে নির্জন পর্বতের পাদমূলে কে এমন করে হাসলো। তবে কি আশা মুক্তিলাভ করেছে?

বনহুর পুনরায় শুকনো পাতার উপরে বসে পরে বললো—আশা এভাবে হাসতে পারে না, কারণ সে মুক্তি লাভ করেনি, করলে আত্মগোপন করার কোন প্রয়োজন ছিলোনা তার।

সর্দার তবে কে এই নারী? যে এমন জায়গায় এমনভাবে হাসতে পারে?

হায়দার, তুমি যেমন অবাক হয়েছো তেমনি আমি নিজেও অবাক হয়েছি, বুঝতে পারছিনা কিছু। তবে যে শব্দ আমরা শুনতে পেয়েছি, তা সত্যি সত্যি হাসির শব্দ নাও হতে পারে। ভাগ্যচক্রে একবার আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে পড়ি আমি এই রকম একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম, তবে সেটা হাসির শব্দ ছিলো না সেটা ছিলো কাশির শব্দ, যেন কোন অসুস্থ ব্যক্তি কাশছে।

সর্দার সে কিসের শব্দ ছিলো?

সে শব্দ ছিলো কোন এক জন্তুর গলার আওয়াজ।

আশ্চর্য।

হাঁ আশ্চর্য বটে। আমার মনে হয় যে হাসির শব্দ আমরা শুনতে পেলাম, সেটা কোন জীব-জন্তুর কণ্ঠস্বর হতে পারে। যেমন ধরো বন মানুষ বা বানর ও হতে পারে।

সে রাতে আর কোন কিছু নজরে পড়লো না বা কোন আওয়াজ শোনা গেলো না। এক সময় ভোর হয়ে এলো।

ঘুমিয়ে পড়েছিলো বনহুর আর হায়দার আলী। হঠাৎ একটা শব্দ হলো।

ঘুম ভেঙ্গে গেলো বনহুরের।

চোখ মেলে তাকালো বনহুর। গুহার বাইরে বেশ ফর্সা হয়েছে, কিছুটা আলো প্রবেশ করছে গুহার মধ্যে। গুহার মুখে নজর পড়তেই বনহুর চমকে উঠলো ভীষণভাবে, সে দেখতে পেলো একটি মনুষ্য মূর্তি উকি দিচ্ছে গুহার মধ্যে, বনহুর চোখ মেলে তাকালেও সে মাথা উঁচু করলো না বা কোন রকম শব্দ করলো না। দেখতে লাগলো চুপি চুপি বাঁক দৃষ্টি ফেলে।

মনুষ্য মূর্তি পুরুষ নয় নারী, বেশ বোঝা গেলো,. আরও বোঝা গেলো সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার মাথার চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে সমস্ত পিঠে কাঁধে, চুলগুলো অত্যন্ত লম্বা, প্রায় হাটু অবধি ঝুলছে। হাতে বেশ বড় বড় নখ, বাঁকা হয়ে আছে। শরীরের কিছু কিছু লোম আছে বলে মনে হলো তার।

বনহুর শুধু অবাকই হলো না। ভীষণভাবে বিস্মিত হলো কারণ এই নির্জন পর্বতের পাদ মূলে বন জঙ্গলে মানুষ এলো কোথা থেকে। তবু সে পুরুষ নয় নারী। বনহুর নিশ্চুপ দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে, ওপাশে হায়দার আলী দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। সমস্ত রাত সে জেগে ছিলো, কারণ সর্দার যখন ঘুমাচ্ছিলো তখন ও ঘুমাতে পারে না হঠাৎ যদি কোন জীব-জন্তু গুহায় প্রবেশ করে তাই সজাগ ছিলো সে সমস্ত রাত। ভোর হবার পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েছে হায়দার আলী।

বনহুরও ঘুমিয়ে ছিলো, সে একটু শব্দ হওয়া মাত্র জেগে উঠেছিলো এবং ঐ অদ্ভুত নারীমূর্তি দেখামাত্র একেবারে বিস্মিত হয়ে পড়েছিলো। কারণ সে আজ পর্যন্ত এমন বিস্ময়কর নারী মূর্তি দেখে নাই।

বনহুর লক্ষ্য করলো নারী মূর্তিটি উঁকি ঝুঁকি মেরে গুহার মধ্যে দেখছে। তাদের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করছে কেমন যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে। বনহুর বুঝতে পারলো নারী মূর্তি তাদের দিকে ভীতভাবে তাকাচ্ছে।

ঠিক ঐ সময় হায়দার পাশ ফিরলো।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত নারীটি বেরিয়ে গেলো বিদ্যুৎ গতিতে। বনহুর এবার উঠে দাঁড়ালো দ্রুত তারপর গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো, দেখলো সেই উলঙ্গ নারী মূর্তিটি এক দৌড়ে ছুটে অদৃশ্য হলো ওদিকে ঝোপটার আড়ালে।

বনহুর মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো তারপর গাছপালার আড়ালে আত্মগোপন করে এগুলো সে সম্মুখের দিকে। ভোরের আলোতে চারিদিক ঝলমল করছে।

বনহুর দক্ষিণ হস্তে রিভলভার চেপে ধরে অগ্রসর হলো। কিছুটা এগুতেই নজরে পড়লো ওদিকে ঝোপটা বেশ দুলছে। ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়ালো বনহুর তারপর কি যেন ভেবে পুনরায় ঝোপের দিকে এগুতে লাগলো। কিছুটা এগুতেই হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো ঝোপটার মধ্যে দিয়ে ওপাশে।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো, দেখতে পেলো সেই অদ্ভুত নারী মূর্তিটি মরা ঘোড়ার মাংস কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে।

বনহুর আরও কিছুটা এগুলো, এবার সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কি বীভৎস কাণ্ড, মরা গোড়াটির যে স্থান গণ্ডারের খর্গের আঘাতে ঘায়েল হয়েছিলো ঠিক সেই জায়গায় থেকে সে মাংস ছিড়ে ছিড়ে ভক্ষণ করছে। বনহুর কিছুক্ষণ অবাক চোখে দেখলো, তারপর ফিরে এলো গুহায়।

গুহার মধ্যে প্রবেশ করে বনহুর দেখতে পেলো, হায়দার আলী তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। বনহুর এসে দাঁড়ালো হায়দার আলীর পাশে, চাপা কণ্ঠে ডাকলো—হায়দার......হায়দার......মৃদু থাক্কা দিতেই ধড়মড় করে উঠে বসলো হায়দার আলী।

বনহুর বললো—হায়দার দেখবে এসো।

বিস্ময় ভরা চোখে তাকালো হায়দার সর্দারের মুখের দিকে। সে সর্দারকে বেশ উত্তেজিত দেখতে পেয়ে নিজেও বেশ ঘাবড়ে গেলো, বললো সর্দার কি হয়েছে?

সেই কণ্ঠস্বর যার তাকে দেখবে এসো।

সর্দার সেই হাসির শব্দ যার কণ্ঠের তাকে আপনি দেখেছেন?

হাঁ এসো, কিন্তু খুব সাবধান বুঝলে?

আচ্ছা সর্দার।

হায়দার আলী চোখ রগড়ে উঠে দাঁড়ালো। তার চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। না জানি কি দেখবে কে জানে।

বনহুর বললো হায়দার, তোমার কোমরের বেল্ট থেকে রিভলবার খুলে নাও।

আচ্ছা সর্দার।

এসো এবার।

হায়দার আলী রিভলভার হাতে নিয়ে সর্দারকে অনুসরণ করলো। সে ভেবে পাচ্ছে না কি ব্যাপার। রাতে কোন কিছু ঘটলোনা, ভোরে কি ঘটেছে কিই বা নজরে পড়লো সর্দারের। মনে মনে প্রশ্ন জাগলেও মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলো না। এগুলো সে বনহুরের পিছু পিছু।

বনহুর সেই ঝোপটার পাশে এসে দাঁড়ালো। পিছনে হায়দার আলীও এসে দাঁড়িয়েছে। বললো বনহুর—সম্মুখে তাকিয়ে দেখো হায়দার।

হায়দার সম্মুখে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো—সর্দার মানুষ না রাক্ষসী? কি আশ্চর্য মৃত অশ্বের মাংস ভক্ষণ করছে।

হাঁ এবং ঐ রাক্ষসীর কণ্ঠের হাসির শব্দই রাতে আমরা শুনতে পেয়েছিলাম। হায়দার আরও একটি কথা, ঐ রাক্ষসী গুহাতেই আমরা আজ রাত কাটিয়েছি।

সর্দার।

হাঁ, কারণ আমরা যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন ঐ রাক্ষসী আমাদের গুহায় প্রবেশ করেছিলো এবং সে ভীত নজরে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলো।

সর্দার এমন গহন জঙ্গলে নির্জন পর্বতের পাদমূলে মানুষ এলো কি করে? অবশ্য যদিও এখন সে রাক্ষসী বনে গেছে তবে মানুষ তো বটে।

হাঁ, ওকে দেখে মানুষ বলে মনে হয়, শুধু হয় না আসলেই ও মানুষ এবং বহুদিন সে বন জঙ্গলে কাটিয়ে সম্পূর্ণ বন মানুষ বনে গেছে। দেখছো না ও একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় রয়েছে।

তাই তো, জংলীরাও পাতা বা গাছের ছাল পরে কিন্তু এ তাও পরেনি।

পরেনি নয় হায়দার, পরতে জানে না।

ঐ দেখুন সর্দার কি ভাবে কাঁচা মাংস ভক্ষণ করছে।

কাঁচা তারপর আমার মরা ঘোড়ার মাংস, তা হলে ভেবে দেখো ও একেবারে রাক্ষসী বনে গেছে।

সত্যি বড় আশ্চর্য।

কিন্তু এখন ওকে নিয়ে ভাবার সময় নেই হায়দার, তুমি ফিরে যাও হিন্দল ঘাটিতে। কিন্তু তার পূর্বে জীবন্ত অশ্বটিকে খুঁজে বের করতে হবে।

অশ্বটি কোথায় গেলো সর্দার?

আমিও তাই ভাবছি, তবে যেমন করে হোক খুঁজে নিতে হবে। বেশি বিলম্ব করা ঠিক হবে না হায়দার—যাও খুঁজে দেখো।

আপনি একা......

আমি পর্বত বেয়ে উপরে উঠে যাবো, হাঁ সেই ম্যাপখানা একবার আমাকে দেখতে হবে।

চলুন সর্দার আগে আপনার পথ দেখে নি। ঐ দেখুন সর্দার রাক্ষসী মাংস ভক্ষণ শেষ করে উঠে দাঁড়ালো। এদিকে আসতে পারে......

না, এদিকে এখন আসবে না কারণ সে জানে তার গুহা অপরে দখল করে নিয়েছে, তবে হাঁ, সে সন্ধ্যার পূর্বে পুনরায় তার গুহায় ফিরে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। চলো এবার গুহায় বসে ম্যাপ খানা দেখে নি।

হায়দার আলী তাকিয়ে ছিলো, রাক্ষসীটা তখন চলে যাচ্ছে ওদিকে একটি জলাশয়ের দিকে।

বনহুর আর হায়দার আলী সে দিকে লক্ষ্য না করে ফিরে এলো গুহার মধ্যে। সেখানে তাদের খাবার ও পানীয় ছিলো আর ছিলো পুটলি টা।

অবশ্য ম্যাপখানা বনহুরের পকেটেই ছিলো। বনহুর গুহা মধ্যে প্রবেশ করে বললো—এসো, প্রথমে আমরা কিছু খেয়ে নি। না হলে হয়তো আর এমন সুযোগ আসবে না।

হায়দার আলী পুটলি খুলে শুকনো খাবারগুলো বের করলো। সর্দারকে দিলো এবং সে নিজে নিলো।

খাবার এবং পানীয় পান করে বনহুর পকেট থেকে বের করলো ম্যাপ খানা। ম্যাপ মানে একটি ছোট্ট কাগজে কয়েকটি রেখা যা তাকে দিয়েছিলো চীনা বৃদ্ধের পুত্র লিয়ং-লিচু।

কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে কাগজখানা পরীক্ষা করে বনহুর পকেটে রাখলো, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো—হায়দার, এ গুহায় এটাই আমাদের শেষ দেখা বুঝলে?

হায়দার কোন কথা বললো না।

বনহুর আর হায়দার আলী বেরিয়ে এলো গুহার বাইরে।

বনহুর আর হায়দার আলী নিজ-নিজ পুটলি তুলে নিয়েছে কাঁধে। পুটলিতে কিছু পানীয় আর খাবার ছিলো।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে সম্মুখে দৃষ্টি ফেলতেই বনহুর দেখতে পেলো তার অশ্ব দিব্য আড়ালে ঘাস ভক্ষণ করছে। বললো বনহুর—হায়দার যাত্রা শুভ হবে, যাও তুমি।

সর্দার আপনি একা......

আমার জন্য কিছু ভেবো না, আমি আশাকে নাংচু-হুয়াং এর বন্দী শালা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে ফিরে আসবো......যাও আর বিলম্ব করো না। আর শোন গিয়েই তুমি জম্বু যাবে এবং জম্বুর রাত্নাগার থেকে সেই সব স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নিয়ে আসবে কান্দাই আস্তানায়, সেখানে আমি ফিরে এলে বিচার হবে তাদের।

আচ্ছা সর্দার! হায়দার আলী কুর্নিশ জানিয়ে চলে যায়। যেদিকে অশ্বটি বিচরণ করে ফিরছিলো সেই দিকে।

বনহুর পুনরায় পকেট থেকে সেই ক্ষুদ্র ম্যাপখানা বের করে মেলে ধরে চোখের সামনে।

❑

পর্বতের গা বেয়ে উঠে চলেছে বনহুর।

যত উপরে উঠছে ততবেশি ঠান্ডা বলে মনে হচ্ছিলো তার। গরম কাপড় ভেদ করে ঠান্ডা যেন শরীরে বিদ্ধ হচ্ছে, মাথার পাগড়ি দিয়ে চোয়ালটা সে ভাল ভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলো, তবু জমে আসার উপক্রম হচ্ছে তার সমস্ত দেহটা।

পর্বতের গা বেয়ে উপরে উঠেছিলো আর ভাবছিলো ঐ উলঙ্গ নারী মূর্তিটার কথা। এই দারুন শীতের দিন সে কি করে সর্বাঙ্গ উলঙ্গ অবস্থা রয়েছে। ঠিক পশুর মত হয়েছে তার স্বভাব। কে এবং কোথা থেকে এলো সে এই পর্বতের পাদমূলে কে জানে।

অনেকটা উপরে উঠে এসেছে বনহুর। সূর্য্য তখন মাথার উপরে, তবু ঠান্ডা হওয়া বইছে। কন-কন করছে বনহুরের দেহটা। মাঝে-মাঝে একেবারে খাড়া দেওয়ালের মত পর্বতের গা, এই সব জায়গাগুলো বনহুর খুব সাবধানে এগুচ্ছিলো। একটু পা ফসকে গেলে আর রক্ষা নাই। একেবারে গড়িয়ে পড়বে হাজার হাজার ফুট নিচে। আর খাদের মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে দেহটা।

সম্মুখে একটু সমতল জায়গা পেয়ে একটু স্থির হয়ে দাঁড়ালো বনহুর। এতো শীতেও ললাটে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বনহুর গালপাট্টাটি একটু হালকা করে নিয়ে তাকায় উপরের দিকে, এখনও আরও অনেক উঁচুতে তাকে উঠতে হবে। ঐ উঁচু শৃঙ্গটির দক্ষিণ পাশে আছে একটি সুড়ঙ্গ পথ, সেই সুরঙ্গ পথ তাকে আবিষ্কার করতে হবে। লিয়ং-লিচু বলেছে ঐ সুড়ঙ্গ পথে কেউ প্রবেশ করলে দস্যু নাংচু জানতেও পারবে না কিছু। কারণ নাংচু জানে এ পথে কেউ কোনদিন তার দুর্গম দুর্গ মধ্যে প্রবেশে সক্ষম হবে না।

বনহুর তাই এই পথে আশার উদ্ধার মনস্থ করেছে। যত কঠিন হোক তবু সে পিছপা হবে না।

একটু বিশ্রাম করে নিলো বনহুর তারপর পুনরায় সে উঠে দাঁড়ালো। সম্মুখে পর্বতে গা বরফে ঢাকা, মাঝে-মাঝে শেওলা ধরনের উদ্ভিদ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

বনহুর পা বাড়াবার উপক্রম করতেই হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো সেই খিল খিল হাসির শব্দ। চমকে ফিরে তাকালো বনহুর কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলো না। আশ্চর্য হলো। পর্বতের এতো উঁচুতে কি করে এলো সে সেই উলঙ্গ নারীটি। এ হাসির শব্দ তারই কণ্ঠের তাতে কোন সন্দেহ নাই।

বনহুর এদিক ওদিক ভালভাবে লক্ষ্য করে এগুলো। কয়েক পা অগ্রসর হয়েই আবার বেশ খাড়া পথ। এ পথ শুধু বরফে আচ্ছাদিত। সূর্যের আলোতে রূপার মত ঝল-মল করছে চারিদিকে।

বেশ ভাল লাগছে বনহুরের। শরীরটা অনেকখানি গরম হয়ে এসেছে। আপন মনে এগুচ্ছে সে। যদিও উঠতে কষ্ট হচ্ছে তবু তার মনে নতুন উদ্যম। আশা তার পথ চেয়ে আছে, আশার মুখখানা মনে পড়তেই একটা হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে। আশার সঙ্গে দিনগুলোর কথা মনে পড়তে লাগলো তার।

আপন মনে এগিয়ে যাচ্ছে বনহুর। এমন সময় হঠাৎ তার কানের কাছ দিয়ে সাঁ করে চলে গেলো একটা পাথরে নুড়ি। ছোট্ট একটা পাথরখণ্ড বলা যেতে পারে। বনহুর সজাগ হতে গিয়ে একটু সরে দাঁড়ালো। ঠিক তখনই আর একটা ঢিল চলে গেলো তার পাশ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই হাসির শব্দও ভেসে এলো।

বনহুর যেমন পিছন ফিরে তাকাতে গেছে অমনি টাল সামলাতে না পেরে একেবারে গড়িয়ে পড়লো। কোন মতেই সে নিজকে আটকে রাখতে পারলো না।

❑

যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো তখন সে চোখ মেলে তাকাতেই দেখতে পেলো কঠিন ভাবে তার হাত-পা পিছমোড়া করে বাঁধা আছে। একটা অন্ধকারময় কক্ষে সে বন্দী।

মাটিতে পড়েছিলো সে, এবার উঠে বসলো অতি কষ্টে। বুঝতে পারলো মাথায় চোট লেগেছে এবং মাথা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কিছুটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে কপালে, কেমন চট্-চটে লাগছে কপালটা।

কাঁধের পাশেও ব্যথা করছে, মনে হচ্ছে কাঁধটা মচকে গেছে ভীষণভাবে। অন্ধকারে কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না তবু বনহুর তাকালো নিজের দেহের দিকে কিন্তু নিজের দেহখানাও নজরে পড়লো না। মনে করতে চেষ্টা করলো সব কথা। একটু একটু করে সবই স্মরণ হলো। কেমন ভাবে পিছনে একটু সরে দাঁড়াতে গিয়ে গড়িয়ে পড়েছিলো তারপর নিচে আরও নিচে গড়িয়ে চললো......আর মনে নেই কোন কথা।

এখন ধীরে ধীরে সব খেয়াল হলো, বুঝতে পারলো সে নিচে গড়িয়ে পড়ার পর কে বা কারা তাকে বন্দী করে ফেলেছে। কিন্তু কারা তারা? আশার কথা মনে পড়লো, আশা দিনের পর দিন তার পথ চেয়ে আছে। না জানি এখন সে কোথায় কেমন আছে।

বনহুরের হাত দু'খানা পিছমোড়া অবস্থায় বাঁধা থাকায় বেশ কষ্ট অনুভব করছিলো। কপালের জমাট রক্তগুলো কেমন যেন চট্চটে লাগছে। পিপাসা বোধ করছে সে অত্যন্ত। অন্ধকারে ভালভাবে তাকালো বনহুর চারিদিকে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ একটা আলোর ঝলকানি ভেসে এলো গুহার মধ্যে।

ঠিক বনহুরের মুখে এসে পড়লো আলো ছটা। চোখ দুটো যেন বাধিয়ে ফেললো মুহূর্তের মধ্যে।

বনহুর একবার চোখ দুটো বন্ধ করে আলোক ছটার দীপ্ত রশ্মি সহ্য করে নেয় তারপর চোখ মেলে ধরে সম্মুখের দিকে। বনহুর বুঝতে পারলো যে আলোক ছটাটা তার মুখমণ্ডলে এসে পড়লো তা দেয়ালের কোন এক ফুটো দিয়েই ভিতরে প্রবেশ করছে। এবং সেটা কোন তীব্র টর্চের আলো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আরও বুঝলো বনহুর, দেয়ালের বাহির থেকে কেউ বা কারা তাকে লক্ষ্য করছে। বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না বনহুরকে। হঠাৎ এক পাশের দেয়াল ফাঁক হয়ে গেলো। এবার সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলো দু'জন বলিষ্ঠ চেহারার লোক।

কক্ষ মধ্যে তখন আলো ঝলমল করছে। সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। লোক দু'জন অত্যন্ত বেটে এবং মোটা সোটা। চোখ দু'টো ক্ষুদ্র হলেও তার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর তীব্র বলে মনে হলো বনহুরের কাছে। লোক দু'জন কথা বললো বনহুর তার এক বর্ণও বুঝতে পারলো না। তবে এটুকু সে বুঝতে পারলো এই দু'জনার একজন দস্যু নাংচু-হুয়াং তাতে কোন ভুল নেই।

বনহুর ভালভাবে তাকিয়ে দেখলো। মনে মনে ভাবলো যাক তাকে আর কষ্ট করতে হলো না। আপনা আপনি পৌঁছে গেছে গন্তব্য জায়গায়, তবে ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পেরেছে কিনা তাই বা কে জানে।

নাংচু-হুয়াং তার সঙ্গীকে কি যেন বললো।

সঙ্গী বনহুরের হাত দু'খানার বাঁধন পরীক্ষা করে দেখলো তারপর সেও কিছু বললো নাংচু-হুয়াংকে। নাংচু-হুয়াং এবার পা বাড়ালো দরজার দিকে।

তার সঙ্গীও তাকে অনুসরণ করলো।

বনহুর বুঝতে পারে তাকে ওরা লক্ষ্য করলো এবং পরীক্ষা করে দেখলো সে কোন রকমে যেন পালাতে না পারে। এবার ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলো। বনহুর ভাবছে, কি তার ভাগ্যে আছে কে জানে।

হাত দু'খানা পিছন দিকে বাঁধা থাকায় খুব কষ্ট হচ্ছে বনহুরের। তবু নীরব থাকা ছাড়া কোন উপায় নাই। ক্ষুধাও বোধ হচ্ছে ভীষণ ভাবে। বহুদিন বনহুর ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটিয়েছে তবু এমন অসুস্থ বোধ করেনি। আজ যেন কেমন লাগছো তার।

বনহুর দেয়ালে ঠেশ দিয়ে পা দু'খানা সম্মুখে ছড়িয়ে দিলো। চোখ দু'টো বন্ধ করলো নীরবে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে দেয়ালটা আবার সরে গেলো এক পাশে। গুহায় প্রবেশ করলো এক বৃদ্ধ। বনহুর লক্ষ্য করলো তার হাতে কিছু আছে।

বৃদ্ধ গুহায় প্রবেশ করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বললো—বাপু কে তুমি? আর কেমন করেই বা তুমি পর্বতে উঠেছিলে আর গড়িয়ে নিচে পড়লেই বা কেমন করে।

বৃদ্ধের চলার ভঙ্গী দেখে হাসি পেলো বনহুরেরও। তার ভরসাও এলো মনে এতোক্ষণে যেন সে একটা পথ পেলো খুঁজে।

বৃদ্ধের হাতে কিছু রয়েছে, কিন্তু তা কি, এখনও বোঝা যাচ্ছে না। বৃদ্ধ বক বক করছে তখনও। বাপু, যে এদিকে আসে সে আর কোন দিন ফিরে যেতে পারে না। নাও, এগুলো এবার খেয়ে নাও দেখি।

বনহুর বুঝতে পারলো খাবার এনেছে বৃদ্ধ। মনে মনে খুশি হলো, যাক বাঁচলো এবার তবু। বনহুর এতোক্ষণ নিশ্চুপ ছিলো, এবার সে ইংরেজি ভাষায় জবাব দিলো পথ ভুল করে এদিকে এসেছিলাম বাবা, হঠাৎ পথ চলতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে যাই।

বৃদ্ধ তার সম্মুখে খাবার রেখে বললো—তুমি বড় অসাবধান বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ, ছোট বেলা থেকেই আমার এ বদ অভ্যাস ছিলো।

ছিলো নয় এখনও আছে বলো।

ঠিক তাই, বদ অভ্যাসটা কিছুতেই ছাড়তে পারিনি।

এবার তাহলে উচিৎ শিক্ষা লাভ করো।

হাঁ, বড় উচিৎ শিক্ষা পেয়েছি।

নাও এবার খাও দেখি।

কিন্তু খাবো কি করে? হাত দু'খানা তো আমার পিছমোড়া করে বাঁধা।

তাই তো.......বৃদ্ধ বেশ ঘাবড়ে গেলো, ব্যস্তও হলো সে ভীষণ ভাবে।

বনহুরের যদিও কষ্ট হচ্ছিলো তবু সে বৃদ্ধের ব্যস্ততা লক্ষ্য করে বললো—এখন তুমি খাইয়ে দাও তারপর আমার হাত দু'খানা মুক্ত করে দেবার চেষ্টা করো।

বৃদ্ধ খুশি হলো তার কথা শুনে। এবার সে নিজ হাতে বনহুরের মুখে খাবার তুলে দিতে লাগলো। খাবার খেতে খেতে একবার চমকে উঠলো বনহুর, বললো—এ তুমি কি খাওয়াচ্ছো বাবা?

বৃদ্ধা বললো—আমাদের সবচেয়ে ভাল খাবার।

কি এটা?

সাপের মাংস।

বলো কি বাবা?

হাঁ।

বনহুর থু থু করে ফেলে দিলো মুখ থেকে, যা তার মুখে তুলে দিয়েছিলো বৃদ্ধ।

এবার বৃদ্ধ অবাক হলো, বললো সে—তোমরা আশ্চর্য মানুষ বাপু।

কেনো?

ভাল খাবার তোমরা খাও না।

ভাল খাবার কাকে বলছো বাবা, ঐ সাপের মাংসগুলোকে?

হাঁ, ওগুলো আমাদের প্রিয় খাবার। জানো বাপু, তোমার পাশের গুহায় একটি মেয়ে আছে—সেও তোমার মত ওসব খায় না।

সত্যি! বৃদ্ধের কথাটা যেন বনহুরের মনে একটা আনন্দ উৎস বইয়ে দিলো। বললো—কে সে মেয়েটি বাবা?

বন্দী। ঠিক তোমার মত বন্দী নয়, তাকে দলপতি ধরে এনেছে অনেক কষ্ট করে বুঝলে?

হাঁ বুঝলাম, কিন্তু কি তার অপরাধ ছিলো?

অপরাধ।

হাঁ, কি অন্যায় সে করেছিলো?

সে আমাদের দলপতির জাহাজে হানা দিয়েছিলো এবং আমাদের বনহুর ধন সম্পদ কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলো তাই......

তাই তাকে তোমরা আটক করেছো?

অনেক কৌশলে করে তবেই তাকে দলপতি আটক করতে সক্ষম হয়েছে। জানো বাপু, মেয়েটি বড় ভাল, আমাকে সে কত ভালবাসে।

তাই নাকি?

হাঁ! ঠিক আমার মেয়ের মত সে।

সত্যি বলছো?

মিথ্যা আমি বলি না, বলার অভ্যাস আমার নেই। কি জানি বাপু, মেয়েটি দেখার পর থেকে আমার খুব ভাল লেগেছে তাই তাকেও আমি ভালবাসি।

বনহুর বুঝতে পারলো বৃদ্ধ যার কথা বলছে সে অন্য কেউ নয়—আশা। যাক, মস্ত একটা কাজ হলো, পর্বত থেকে গড়িয়ে পড়ে। হয়তো ক'দিন লেগে যেতো ওর সন্ধানে......

বৃদ্ধ বললো—কি ভাবছো?

ভাবছি তুমি বড় ভাল মানুষ, এমন লোক না হলে নয়। আচ্ছা বাবা তোমার কি কোন ছেলে আছে?

আছে।

তার নাম লিয়ং-লিচু নয় কি?

বাপু! তুমি কেমন করে তার নাম জানলে? বৃদ্ধ অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো। অবশ্য অবাক হবার কথাই বটে কারণ এই অন্ধকার কারা কক্ষে তাদেরই বন্দীর মুখে তার সন্তানের নাম শুনে থ'হয়ে গেলো যেন সে।

বনহুর বললো—সে আমাদের লোক।

বলো কি বাপু?

হাঁ বাবা।

বনহুর বুঝতে পেরেছিলো—এই সেই বৃদ্ধ। লিয়ং-লিচু ম্যাপখানা তার হাতে দেবার সময় বারবার বলেছিলো—সর্দার আমার বাবা নাংচুর দলে আছে। সে এখন বৃদ্ধ, কোন কাজ করতে পারে না, সে শুধু বন্দীদের খাবার দেয়। প্রথম বৃদ্ধকে দেখেই বনহুরের মনে লিয়ং-লিচুর কথাটা উদয় হয়েছিলো। এখন বুঝতে পারলো এই বৃদ্ধই সেই ব্যক্তি লিয়ং-লিচুর বাবা। চোখ দুটো আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো বনহুরের, যাক এবার তা হলে আশাকে উদ্ধার করা মোটেই কঠিন হবে না।

বৃদ্ধ খুশি হয়েছে, বললো সে—বাপু, তুমি বুঝি আমার ছেলের সঙ্গে কাজ করো?

হাঁ।

তবে এখানে কেনো এসেছিলে মরতে?

ঐ তো বললাম পথ ভুল করে।

কিন্তু এখন পা ফসকে পড়ে গেলে আর ঠিক এসে পড়লে আমাদের দলপতির সম্মুখে......

তাই তো দেখছি। বাবা তোমাকে তোমাকে একটা উপায় করতে হবে, যেমন করে হোক আমার হাত দু'খানা মুক্ত করে দিতে হবে। পারবে না তুমি?

পারবো কিন্তু......

বলো থামলে কেনো।

একটু সময় লাগবে।

কি রকম?

এই ধরো যে বা যার কাছে তোমার হাত কড়ার চাবি আছে তাকে হাত করতে হবে, না হলে তো কোন মতেই তোমার হাত দু'খানা মুক্ত করতে পারছি না।

বেশ তাই করো। বাবা তুমি এতো মহৎ ভাবতে পারিনি। যাও আজ যা খাইয়েছো অনেক, আবার আসবে তখন চাবি আনতে ভুলো না।

বেরিয়ে গেলো বৃদ্ধ।

বনহুর একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এতো সহজে আশার সন্ধান পাবে সে ভাবতেও পারেনি। ভাবতে পারেনি তার পাশেই কোন এক বন্দীশালায় আছে সে।

❑

নাংচু-হুয়াং এর প্রহরীরা সর্তকতার সঙ্গে পাহারা দিচ্ছে। যেন কোন বন্দী তাদের বন্দীশালা থেকে পালিয়ে যেতে না পারে। হুয়াং-এর এ দুর্গ পর্বতের গভীর তলদেশে কাজেই বন্দীগণ সহজে পালাতে পারবে না এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলো নাংচু-হুয়াং ও তার দলবল। তবু প্রহরী পাহারা দিতো নিয়ম অনুযায়ী।

হিয়াংচু দুর্গের প্রবেশ পথে রয়েছে, চীনা দৈত্য হিং হুকং। যেমন বিরাট তার দেহ তেমনি ভয়ঙ্কর তার চেহারা, তেমনি শক্তি তার দেহে। কতকটা নাংচু-হুয়াংএর মতই ছিলো সে। তাই তার নামের পূর্বে দৈত্য ব্যবহার করা হতো।

হিং-হুকং-এর গর্জন ছিলো গরীলা রাজের হুঙ্কারের মত, তাই ভয় পেতো সবাই ওকে। যদি সে রাগ করে ডাক ছাড়তো তা হলে সমস্ত পর্বত যেন কেঁপে উঠতো থরথর করে।

বন্দীশালার সমস্ত চাবি থাকতো ঐ দৈত্য রাজের কাছে।

বৃদ্ধ চীনাটি জানতো, চাবি নিতে হলে দৈত্যরাজ হিং-হুকংকে খুশি করতে হবে। বৃদ্ধ তাই করলো, এক পাত্র চীনা মদ নিয়ে সে হাজির হলো দৈত্যরাজ হিংহুকং এর সম্মুখে। তাকে মদ খাইয়ে তার কাছ থেকে বৃদ্ধ আদায় করে নিলো চাবির গোছা, তারপর সে আলগোছে চলে এলো বনহুরের কাছে।

অবশ্য সে খাবারের থালার মধ্যে চাবির গোছাটা লুকিয়ে নিয়ে এসেছো।

বনহুর বসেছিলো দেয়ালে ঠেশ দিয়ে।

হাতের ব্যথাটা আজ আরও বেশি, তা ছাড়া মাথায় ক্ষতস্থান টা টন— টন করছে যন্ত্রণায়। একটু হাতখানা বুলিয়ে নেবে তারও উপায় ছিলো না।

বৃদ্ধকে দেখে খুশি হলো বনহুর। কারণ সে জানে বৃদ্ধ যা বলেছে তা সে না করেই পারে না। অবশ্য বনহুরের মনে এ বিশ্বাস জন্মেছিলো লিয়ং-লিচুর কথায়। সে বলেছিলো বাবা বড় নীতিবান লোক, যা বলবে তা সে করবে। বনহুরের কানে সেই কথাগুলো আটকে ছিলো আঠার মত।

বললো বনহুর—বাবা চাবি এনেছো?

বৃদ্ধা খাবারের থালা তার সম্মুখে রাখতে রাখতে বললো—এ বুড়ো যা বলবে তা কোনদিন মিথ্যা হবে না। এই দেখো চাবি নিয়েই এসেছি।

সত্যি!

হঁ।

বৃদ্ধ চাবির গোছা বের করে এগিয়ে এলো—দেখি আগে তোমার হাত দু'খানা মুক্ত করে নেই।

বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিলো বৃদ্ধের দিকে। বৃদ্ধ চাবির গোছা নিয়ে খুলে দিলো বনহুরের হাতের হাত কড়া।

হাত দু'খানা মুক্ত হতেই বনহুর নিজের হাতের উপর হাত বুলিয়ে নিলো। বেশ আরাম বোধ করছে সে এখন। বনহুর বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরলো বুকে।

বৃদ্ধ নিজেও খুশি হয়েছে।

বললো এবার সে—নাও বাপু এবার নিজের হাতে খেয়ে নাও।

হাঁ, আজ তাই খাবো। তুমি আরাম করো......বনহুর নিজ হাতে গো গ্রাসে খেতে শুরু করলো।

বৃদ্ধ বললো—তুমি ততক্ষণ খাও আমি ওর ঘরে খাবার দিয়ে আসি।

কার ঘরে?

আমার মেয়ের ঘরে। আমার মেয়ে বন্দীশালায় বুঝলে?

মেয়ে! কে তোমার মেয়ে?

ঐ তো কাল যার কথা বলেছিলাম।

তাকেও তুমি খাবার দাও?

শুধু তাকে কেনো, এই হিয়াংচু দুর্গে যত বন্দী আছে সবাইকে আমি খাবার দেই। তবে কয়েকজন বন্দীকে খেতে দেওয়া মানা আছে।

কেনো? কেনো খেতে দেওয়া মানা আছে?

যারা দলপতির অবাধ্য তাদের শাস্তি না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মারা। যেমন আশাকে খেতে দেয়া মানা আছে......

আশা!

হাঁ আশা ওর নাম।

কেনো, কেনো তাকে খেতে দেওয়া মানা আছে? আর তুমিই তো বললে—তাকে খেতে দিতে যাচ্ছো?

হাঁ, মানা আছে কারণ আশা দলপতির কোন কথাই শোনে না, সে তার অবাধ্য তাই ওকে দলপতি খেতে দেয় না। আর আমি বললাম খেতে দিতে যাবো। তোমাকে বললে তো কোন দোষ হবে না, তাই বলছি।

বলো?

আমার নিজের খাবার থেকে চুরি করে ওকে খেতে দেই।

সত্যি!

হাঁ বাপু, সত্য।

শোন, আমার খাবার থেকে ওকে তুমি খেতে দিও। তুমি বুড়ো মানুষ, না খেয়ে কাবু হয়ে যাচ্ছো যে?

ঠিক বলেছো বাপু, আমি রোজ না খেয়ে আশাকে খেতে দেই অবশ্য সে জানে না, জানলে কিছুতেই খেতো না।

আজ থেকে তুমি পেট পুরে খাবে আর আমার খাবার থেকে তাকে তুমি খেতে দিও।

তোমার কষ্ট হবে না তো?

না না, আমার একটু কষ্ট হবে না। যাও, এই খাবারগুলো নিয়ে যাও।

বৃদ্ধ শুকনো রুটী, মাংস আর দুধ নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর হাতের পিঠে মুখ মুছলো।

বৃদ্ধ বেরিয়ে যাবার সময় দরজা বন্ধ করবার কথা ভুলে গেলো।

বনহুর সেই সুযোগে বেরিয়ে এলো গুহা বা কক্ষটির বাহিরে। ঝাপসা আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছো চারিদিক। বৃদ্ধ যে পথে এগুলো, বনহুর আত্মগোপন করে সেই পথে চললো।

এদিক সেদিক করে কিছুটা এগুনোর পর একটা গুহার মুখে এসে দাঁড়ালো বৃদ্ধ।

বনহুর দেখলো, গুহা বা সেই দুর্গের মধ্যে বহু বন্দী আটক আছে। সবার চেহারাই কঙ্কাল সার, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোফ আর লম্বা চুল।

বন্দীদের দেখে বুঝতে পারলো—তারা নতুন আটককৃত ব্যক্তি কার কি অপরাধ কে জানে।

বৃদ্ধ ঐ বন্দীশালার দরজায় দাঁড়িয়ে একটি সুইচে চাপ দিলো—সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো সেই গুহার কপাট।

বৃদ্ধ ভিতরে প্রবেশ করলো।

আশা উন্মুখ হয়ে বসেছিলো, বৃদ্ধ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করতেই বললো—বাবা তুমি এসেছো? কই সে এলো না তো? গুহার মুখে তুমি গিয়াছিলে আজ?

আগে খেয়ে নাও তারপর সব বলছি। নাও মা, খেয়ে নাও দেখি। বৃদ্ধ কাপড়ের তলা থেকে খাবারের থালা বের করে আশার সম্মুখে রাখলো।

আশা কান্নার সুরে বললো—না আমি আর খাবো না।

তা হলে মরে যাবে যে মা?

বেঁচে থেকে কি লাভ হবে বাবা। যার প্রতিক্ষায় ছিলাম সে এলো না। আমি বাঁচতে চাই না আর।

কিন্তু তোমাকে বাঁচতে হবে মা। আমি জানি তুমি একজন অসাধারণ মেয়ে।

এ বিশ্বাস তোমার কি করে হলো বাবা?

আমি প্রথম দিন তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি—তুমি মেয়ে মানুষ হলেও তোমার মধ্যে আছে বিরাট একটা প্রতিভা।

হাসলো আশা, ম্লান নিস্প্রভ সে হাসি।

বৃদ্ধ বললো—নাও, খাও মা খাও।

আগে বলো, তুমি গুহার মুখে গিয়েছিলে?

হাঁ, গিয়েছিলাম।

কেউ আসেনি বা কারো দেখা পেলে না?

না, কেউ আসেনি, কারো দেখাও পেলাম না। শোন আশা সে আসবে না, তুমি তার জন্য আর ভেবো না।

আমি জানি সে আসবে। তবে তোমার ছেলে যদি......

না না, সে মিথ্যা বলে না, নিশ্চয়ই সে তোমার চিঠিখানা তারহাতে পৌঁছে দিয়েছিলো—আমি নিজে তার মুখে শুনেছি।

কিন্তু চিঠি পেলে সে না এলেই পারে না। জানি না কেন সে আজও আসছে না।

তুমি জানো না, এ দুর্গের পথ কেউ আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে না।

না, তার অসাধ্য কিছু নেই বাবা, তুমি তাকে দেখোনি—দেখলে বুঝতে সে কেমন মানুষ।

তার নাম কি মা?

নাম তো তুমি জানোই বাবা, সে নাকি তোমার ছেলে—লিয়ং-লিচুর সর্দার।

হাঁ, এবার মনে পড়েছে, বনহুর......দস্যু বনহুর তার নাম।

আশার চোখ দু'টো ছল ছল করে উঠলো।

বৃদ্ধ বললো—নাও, এবার খেয়ে নাও দেখি। জানো এ খাবার তোমার জন্য কে দিয়েছে?

তা কেমন করে জানবো?

তোমার মত আমার এক ছেলে। জানো মা, বড় ভাল লোক, বড় ভাল সে। নিজে না খেয়ে তোমার জন্য দিয়েছে।

বলো কি বাবা?

হাঁ মা, বড় ভাল সে। তোমার কথা শুনেই সে নিজে না খেয়ে তোমার জন্য খাবার রেখে দিলো। খেয়ে নাও মা......

আচ্ছা খাচ্ছি। আশা খাবার খেতে শুরু করলো। ভাবছে—কে এমন ব্যক্তি তার মনে এতো দয়া?

আশা খাবার খাচ্ছে আর ভাবছে কত কথা। নাংচু তাকে বন্দী করে নানা ভাবে উৎপীড়ন করছে। তার কাছে জানতে চায় আড্ডাখানার সন্ধান। নাংচু জানে সেই দস্যুরাণী কিন্তু আসলে সে যে দস্যুরাণী নয় বা সে রাণী দুর্গেশ্বরীও নয়। আশা নাংচুকে অনেক বার বলেছে—তুমি ভুল করছো, আমি দস্যুরাণী নই, কিন্তু সে বিশ্বাসই করতে চায় না তার কথা। বিশ্বাস না করার জন্যই নাংচু-হুয়াং আশার উপর চালিয়েছে নির্যাতন।

আশা পালাবার চেষ্টা করেনি তা নয়, কিন্তু সে পালাতে পারেনি। নাংচু ভীষণ কড়া পাহারা নিযুক্ত করছে যাতে দস্যুরাণী এই দুর্গ থেকে পালাতে সক্ষম না হয়।

তাই হলো, আশা বিফল হয়েছে।

বৃদ্ধ বেরিয়ে যায়।

ততক্ষণে আশার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সে নীরবে উঠে দাঁড়ায়। বৃদ্ধ কক্ষে অসহ্য লাগে, তবু কোন উপায় নাই। একটু মুক্ত হাওয়া আর সূর্যের আলোর জন্য প্রাণ ওর আকুলি-বিকুলি করে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা ছায়া এসে পড়ে তার সম্মুখস্থ দেয়ালে। কক্ষটার মধ্যে একটা আলো জ্বলছিলো, সেই আলোর ছায়া এসে পড়েছে। চমকে ফিরে তাকালো আশা, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—বনহুর তুমি! এসেছো?

বনহুর একটু হেসে বললো—না এসে পারলাম না। আশা ভাবতে পারিনি এতো সহজে তোমাকে দেখতে পাবো। আশা আর মুহূর্ত বিলম্ব করোনা এসো বেরিয়ে এসো আমার সঙ্গে......

কিন্তু......

না এক দন্ড আর দেরী করো না।

নাংচু-হুয়াং-এর প্রহরী বাইরে অপেক্ষা করছে যদি তুমি ধরা পড়ে যাও?

তাতে মৃত্যু হবে।

আমার জন্য মরবে তুমি?

আশা কথা বলার সময় নেই, চলো।

বুড়ো বাবাকে বলা হলো না।

সে সময় আর নাও আসতে পারে চলো। বনহুর আশার হাত ধরে টেনে বের করে নেয় তার বন্দীশালা থেকে।

যেমন সে বন্দীশালার বাইরে বেরিয়েছে অমনি একজন প্রহরী অস্ত্র উদ্যত করে ছুটে আসে।

বনহুর বিদ্যুৎ গতিতে আশাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে প্রহরীর লক্ষ্য থেকে সরে দাঁড়ায় এবং খপ্ করে ধরে ফেলে প্রহরীর অস্ত্র সহ হাতখানা।

প্রহরী হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়।

বনহুর ওর হস্তস্থিত অস্ত্রখানা নিয়ে সজোরে বসিয়ে দেয় ওর বুকে।

একটা আর্তনাদ করে উঠে প্রহরী।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রহরী সজাগ হয়ে উঠে। ঘন্টাধ্বনি শুরু হয়। চারিদিক থেকে প্রহরীগণ ছুটে আসে দিশে হারার মত।

বনহুর তখন আশাকে নিয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। ওদিকে প্রহরীগণ এসে দেখতে পায় তাদেরই এক প্রহরী নিজ অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছে। পড়ে আছে সে ভূতলে রক্তে ভিজে উঠেছে মেঝেটা।

তাজা লাল রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। প্রহরীর দেহটা নীরব হয়ে গেছে। বিপদ সংকেত ধ্বনি শুনে নাংচু-হুয়াং তার বিশ্রামাগার থেকে বেরিয়ে আসে। সবাই দেখতে পায় নিহত প্রহরীকে কিন্তু কেউ বলতে পারে না কে তাকে নিহত করলো।

সমস্ত বন্দীশালায় ঘন্টা ধ্বনি হচ্ছে। প্রহরীরা ছুটা ছুটি করছে। সব বন্দীশালা পরীক্ষা করে দেখা শুরু হলো।

বনহুর আর আশা এসে আত্মগোপন করলো সুড়ঙ্গ মধ্যে এক ছোট্ট খুপড়ীর মধ্যে। পথ তারা চেনে না কেউ, কাজেই কোন পথে অগ্রসর হবে বুঝতে পারে না। হঠাৎ যদি ওদের সম্মুখে পড়ে যায় তা হলে বিপদ অনিবার্য তাতে কোন ভুল নাই।

বনহুর আর আশা দেখছে তাদের সম্মুখ দিয়ে রাইফেল উদ্যত করে ছুটে যাচ্ছে নাংচু-হুয়াং-এর অনুচরগণ। এক একজন ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত হয়ে উঠেছে।

শোনা গেলো দৈত্য প্রহরীর সজাগ কণ্ঠস্বর যেন মেঘের গর্জন বলে মনে হচ্ছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে পর্বতের পাথরগুলো। তার সঙ্গে শোনা যাচ্ছে সেই বিপদ সংকেতপূর্ণ ঘন্টা ধ্বনি।

বললো আশা—বনহুর আমার জন্য তোমার কোন বিপদ না ঘটে। তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল ছিলো।

আমার জন্য যদি এতো চিন্তা তবে কেনো চিঠি দিয়েছিলে?

জানতাম তুমি আমার চিঠি পেলে চুপ থাকতে পারবে না।

তাই তো এসেছি।

কিন্তু তোমার যদি কোন অমঙ্গল হয়......

ক্ষতি নেই।

বনহুর!

আশা বিচলিত হবার সময় এটা নয়। আমি জানতাম নারী হলেও তুমি যারপর নাই সাহসী, কিন্তু......

তোমার জন্য আমি দুর্বল বনহুর। তুমি বিপদে পড়ো এ আমি চাই না.......

চুপ করো, এদিকে কারা আসছে। ভারী বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আশা চুপ হয়ে গেছে।

বনহুরও নিশ্চুপ রইলো।

ভারী বুটের শব্দ ক্রমে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কণ্ঠস্বর—অবশ্য চীনা ভাষায় কিছু বলছে নাংচু-হুয়াং। বোঝা যাচ্ছে বন্দী পালিয়েছে এটা তারা টের পেয়ে গেছে।

ওরা চলে গেলো সম্মুখ দিয়ে।

বনহুর বললো—আশা, এস আমার সঙ্গে।

আশা আর বনহুর পিছন দিক দিয়ে নেমে এলো নিচে। অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলো ওরা দু'জনা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বনহুর এসে পড়লো একটা নির্জন খুপড়ির কাছে। আশাও আছে তার সঙ্গে। এখান থেকে কিছু নজরে পড়লো না। একদিকটা বেশ অন্ধকার। এবার ওরা কতকটা নিশ্চিন্ত হলো।

বনহুর বললো—আশা, জানি না সুড়ঙ্গ পথের গোপন মুখ কোন দিকে? তবে আমার মনে হয় এই দিকেই হবে।

বনহুর আর আশা অন্ধকারে এগুতে লাগলো। বার বার হোচট খাচ্ছিলো আশা তবু সে কোন রকম কষ্ট অনুভব করছিল না। একটা অপূর্ব আনন্দ উৎস তার সমস্ত মনকে অভিভূত করে তুলেছিলো। যার ধ্যান, যার সাধনায় সে নিজকে উৎসর্গ করে দিয়েছে আজ তাকে সে পেয়েছে কাছে। যুগ যুগ যদি সে এমনি করে ওকে কাছে পেতো—সব ব্যথা, সব দুঃখ ভুলে যেতো আশা।

বনহুরের মনে তখন অন্য চিন্তা, কেমন করে নাংচু-হুয়াং এর বন্দীশালা থেকে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে, কেমন করে তাকে পৌছে দেবে তার গন্তব্য জায়গায়। সুড়ঙ্গ পথ খুঁজে বের করতেই হবে তাকে।

বনহুর আর আশা এক সময় পৌছে গেলো একটি গর্তের মত জায়গায়। বনহুর বললো—আশা, ভয় পেয় না, এই গর্তটি কোন গোপন পথ বলে আমার মনে হচ্ছে। তুমি গর্তের মুখে দাঁড়াও আমি ঐ গর্তের মধ্যে প্রবেশ করছি।

আশা বনহুরের একখানা হাত মুঠায় চেপে ধরলো—না আমি তোমাকে একা ঐ গর্তের মধ্যে প্রবেশ করতে দেবো না।

বনহুর অন্ধকারে মৃদু হেসে বললো—এতো ভীতু তুমি?

না, আমি যাবো তোমার সঙ্গে। যদি বিপদ আসে দু'জনার ভাগ্যেই আসবে।

বেশ, এসো।

বনহুর আশার হাত ধরে গর্তের মধ্যে প্রবেশ করলো। বনহুরের অনুমান মিথ্যা নয়, গর্তটি ছিল একটি সুড়ঙ্গ মুখ এবং ওই সুড়ঙ্গ মুখটাই উঠে গেছে উপরের দিকে পর্বতের শৃঙ্গ অভি মুখে। যে শৃঙ্গ লক্ষ্য করে বনহুর সেদিন উপরে উঠে এসেছিলো তবে শেষ অবধি পৌছতে পারেনি পড়ে গিয়েছিলো নিচে একেবারে অজানা পথে।

বনহুর আনন্দধ্বনি করে উঠলো—আশা, পেয়েছি এই সেই পথ যে পথের সন্ধান আমি লিয়াং-লিচুর কাছে পেয়েছিলাম।

এ পথ অতি দূর্গম তাতে কোন সন্দেহ নাই। হয়তো অনেক ভয়ঙ্কর জীব জন্তুর বাসা বনে আছে এ পথে। কেউ কোনদিন নিতান্ত প্রয়োজন বোধেই এ পথ ব্যবহার করতো।

বনহুর আর আশা এগুতে লাগলো।

জমাট অন্ধকার।

বনহুর পকেট থেকে বের করলো খুদে টর্চ লাইটটা। সব সে হারিয়েছে পর্বত থেকে গড়িয়ে পড়ার সময়, শুধু চোরা পকেটের কোনে ছিলো খুদে টর্চখানা।

এই অন্ধকার পথে দুঃসময়ে টর্চটা হলো তাদের পরম বন্ধু।

কিছুটা এগুতেই একটা শব্দ কানে এলো তাদের, কেমন যেন ঘস্ ঘস্ আওয়াজ হচ্ছে।

বনহুর পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো—এ কিসের শব্দ?

আশাও বেশ ভয় পেয়ে গেছে বললো—তাই তো শব্দটা আশ্চর্য ধরণের।

বনহুর টর্চএর আলো ফেলে তাকালো সম্মুখে না, কিছু নজরে পড়ছে না, শুধু জমাট অন্ধকার। তবু না এগিয়ে উপায় নেই, আশার হাত ধরে এগুলো বনহুর।

কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হতে পারলো না, শব্দটা আরও তীব্র মনে হচ্ছে।

বনহুর আশার হাতখানা মুঠায় এটে ধরে বললো—কোন জীব-জন্তু গলার আওয়াজ হবে! কথাটা বলে টর্চের আলো ফেললো বনহুর সম্মুখে এবং আশে পাশে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো ভীষণ ভাবে একটা বিরাট আকার ড্রাম গড়িয়ে গড়িয়ে এদিকে আসছে। ভালভাবে লক্ষ্য করে আশা ভয়ে আঁকড়ে ধরলো বনহুরের জামার আস্তিন।

ড্রামটির কোন হাত বা পা ছিলোনা। ড্রামটি গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে সম্মুখে। দুটি গোফ গোল চোখ, যেন আগুনের দুটি বল। বনহুর আর আশাকে দেখে ড্রামটি বিকটা শব্দ করে উঠলো-ঘস্-ঘস্-ঘস......সঙ্গে সঙ্গে ড্রামটা হা করলো।

সে কি ভয়ঙ্কর জীব, হা করতেই ভিতরে দেখা গেলো বিরাট বিরাট দাঁত সাদা ধপধপে যেন এক একটি ধারালো খর্গ।

আশা দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললো। বনহুর নিজেও বেশ ঘাবড়ে গেছে। এমন ধরণের অদ্ভুত জীব সে কোনদিন দেখেনি। জীবটি দেখতে ঠিক ড্রামের বা জালার মত। ড্রামটার সম্মুখ ভাগে দুটি চোখ, এবং বিরাট একটি মুখগহবর।

ড্রামটা গড়িয়ে আসছে ধীরে ধীরে আর শব্দ করেছে ঘস্-ঘস্-ঘস্......

বনহুরের কাছে কোন অস্ত্র ছিলো না তাই সে একটু ঘাবড়ে গেলো। বার বার টর্চের আলো ফেলছে জীবটার দিকে।

বনহুরের ক্ষুদে টর্চের আলোর তীব্রতা ছিলো অত্যন্ত প্রখর। বনহুর ড্রাম আকারের জীবটির চোখ দুটি লক্ষ্য করে আলো ফেললো।

আশ্চর্য, যেমন জীবটির চোখে আলো পড়েছে অমনি সে গড়িয়ে চললো বিপরীত দিকে।

বনহুর আনন্দ সূচক শব্দ করে উঠলো—আশা, এবার আর কোন ভয় নেই জীবটা পালাচ্ছে।

যতক্ষণ জীবটা দেখা গেলো ততক্ষণ বনহুর টর্চের আলো ধরে রাখলো সেই দিকে।

জীবটা সুড়ঙ্গ পথের কোন এক ফাটল দিয়ে বেরিয়ে গেলো বাইরে অথবা কোন গর্তে সে আত্মগোপন করে ফেললো।

আশাকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—এবার দ্রুত পা চালাতে হবে। এসো আশা......

বনহুর আর আশা সুড়ঙ্গ দিয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলো।

পর্বতের শৃঙ্গ অভিমুখে উঠে গেছে সুড়ঙ্গ পথটা, কতটা খাড়া সিঁড়ির ধাপের মত। বনহুর মাঝে-মাঝে আশাকে সাহায্য করছিলো। এ ছাড়া কোন উপায় ছিলো না কারণ হাজার দুঃসাহসী হোক তবু তো সে নারী।

বনহুর একসময় আশা সহ সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে উঠে এলো উপরে। তখনও রাত ভোর হয়নি, আকাশে তারার মালা পিট-পিট করে জ্বলছে।

এতোক্ষণ সুড়ঙ্গ মধ্যে তেমন শীত বোধ হয়নি, এখন বেশ ঠান্ডা লাগছে শরীরে। হীম হয়ে আসছে শরীরের রক্ত বিন্দু। বনহুর বললো—নিকটে কোন গুহায় রাতের মত আশ্রয় নিতে হবে। না হলে শৃঙ্গ থেকে নিচে পড়ে যাবার ভয় আছে।

তাই চলো—বললো আশা।

বনহুর টর্চের আলো ফেলে দেখছে নিকটে কোন গুহার মুখ আছে কিনা।

না, কোথাও কোন গুহা নজরে পড়লো না।

চারিদিকে শুধু বরফের স্তূপ।

আশা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

এমন ঠান্ডা তার সহ্য হচ্ছে না। বনহুর বললো—আশা তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?

না, আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট করছো বনহুর।

এ ছাড়া কোন উপায় ছিলো না। চলো আর একটু নিচে নেমে যাই, যদি পর্বতের গায়ে কোন গুহা পাই তাহলে রক্ষা, না হলে হয়তো বরফ হয়ে যাবো আমরা দু'জন।

চলো বনহুর তাই চলো।

আশা বনহুরের হাত ধরে নামতে লাগলো নিচের দিকে। অতি সাবধানে নামছে ওরা, যদি পা ফসকে পায় তা হলে আর রক্ষা নাই। অতি সর্তকতার সঙ্গে পা ফেলছে ওরা।

বনহুর বাম হস্তে আশাকে ধরে আছে আর দক্ষিণ হস্তে টর্চের আলো ফেলছে।

বললো বনহুর—আশা এখনও আমরা নিরাপদ নই। হঠাৎ আমাদের টর্চের আলো যদি নাংচুর কোন অনুচরের দৃষ্টি গোপন হয় তা হলে তারা হামলা চালাতে পারে। তবে আমি জানি তারা আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

হঠাৎ আশা বলে উঠলো—সম্মুখে একটি গুহা মুখ আছে বলে মনে হচ্ছে। ঐ দেখো বনহুর।

তাই তো! খুশি ভরা কণ্ঠে বললো বনহুর।

বনহুর আর আশা এসে দাঁড়ালো সেই গুহার মুখে। টর্চের আলো ফেললো বনহুর ভিতরে। সুন্দর ছোট্ট একটি গুহা। বনহুর আর আশা গুহা মধ্যে প্রবেশ করলো। কিন্তু এক গুহায় ওরা দু'জনা কি করে বাস করবে এই হলো সমস্যা। অবশ্য বনহুর এটা ভাবলো না, ভাবছে আশা এবং যে লজ্জা ভরা কণ্ঠে বললো তুমি ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করো, আমি......

আর তুমি বাইরে থাকবে?

কোন কথা বললো না আশা, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো আশা বনহুরকে ভালবাসে সত্যি তাই বলে একটা ছোট্ট গুহায় দু'জন কি করে রাত্রি যাপন করবে ভেবে সঙ্কোচিত হলো।

বনহুর বুঝতে পারলো আশা দ্বিধা করছে তাই সে বললো—এ মুহূর্তে এমন সঙ্কোচ করা উচিৎ নয় আশা। জীবন রক্ষা সব চেয়ে বড় কাজ।

আশা অগত্যা গুহা মধ্যে প্রবেশ করলো।

অন্ধকার গুহা মধ্যে পাশাপাশি বসলো ওরা দু'জন। উভয়ের শরীরের তাপ উভয়ে অনুভব করছে। একজন আর একজনের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

বনহুর ভাবছে ভোর পর্যন্ত তাদের এমনি ভাবে কাটাতে হবে কিন্তু আশা বড় সঙ্কোচিত হয়ে পড়েছে। ওর ঘুমানো একান্ত দরকার।

আশা ভাবছে বনহুরে কথা, এমনভাবে ওকে যে পাশে পাবে এ যেন তার কল্পনার অতীত ছিলো, ওর দেহের উষ্ণতা তার হৃদয় মনকে এক অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে তুলেছে, বড় খুশি লাগছে। সব কষ্ট সব ব্যথা ভুলে গেছে আশা। অতীতের কতগুলো কথা তোলপাড় করছে তার মনের গহনে। সেই জাহাজ থেকে সাগরে পড়ে যাবার কথা। বনহুর তাকে উদ্ধার করেছিলো—বরফের চাপের উপরে তারা ভেসে চলেছিলো বেশ কয়েকদিন ধরে। আজ সেই সব পুরোন স্মৃতি ভেসে উঠে মনের পর্দায়। আশা চুপ করে ভাবতে থাকে।

ঠান্ডায় ঘুম আসে না বনহুরের চোখে, সে এতোক্ষণ নিশ্চুপ ছিলো, এবার বললো—বড় কষ্ট হচ্ছে তাই না?

না। বললো আশা।

জানি তুমি স্বীকার করবে না, যে ঠান্ডা দেহের রক্ত জমে যাবার উপক্রম হচ্ছে। আমার জামাটা তুমি দেহে চাপা দাও আশা।

না না তা হয় না, আমি বেশ আছি।

আশা তুমি নারী আমি পুরুষ, কিন্তু এ মুহূর্তে আমরা উভয়ে মানুষ এটাই মনে করতে হবে। তোমার দেহের সঙ্গে আমার দেহ স্পর্শ হলে সেটা অভিশাপ মনে করো না কারণ আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই তোমার।

আমি জানি বনহুর তুমি মানুষ নও, মহান। তোমার কাছে আমার কোন ভয় নেই, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করি।

হাঁ, এ বিশ্বাস যেন তোমাদের অটুকু থাকে আমি এই কামনা করি দয়াময়ের কাছে। একটু থেমে বললো বনহুর—জীবনটা আমার বড় রহস্যময়

আশা। জানি না বার বার কেনো আমি এই রহস্যময় অবস্থায় এসে পড়ি। যে রহস্য আমার জীবনে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যেমন আজকের রাত। থামলো বনহুর।

আশা বললো—আমি সব জানি। তুমি সবার প্রিয়জন। সবাই তোমাকে ভালবাসে তোমার সঙ্গ পাবার জন্য কামনা করে কিন্তু তোমাকে স্পর্শ করার স্পর্দ্ধা কারো নাই। বনহুর, জানি না তুমি কি......থামলো আশা।

ঠিক ওই মুহূর্তে সেই অদ্ভুত হাসির শব্দ হলো, নারী কণ্ঠের হাস্য ধ্বনি।

আশা সজাগ ভাবে কান পাতলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকালো সে গুহার দরজার দিকে। তা স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলো একটি উলঙ্গ নারী মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে গুহার মুখে।

আশা ভীতভাবে বনহুরের জামা চেপে ধরে মুখ লুকালো তার বুকে, একটা ভয়াতুর শব্দ করলো সে।

নারী মূর্তিটি তখনও হাসছে খিল্ খিল্ করে। তার এলায়িত চুলগুলো ঝুলছে হাটু অবধি।